মুক্তিযুদ্ধে পদ্মা ও পলাশ

মোঃ শফিকুল হক

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা কারোরই অজানা নয়। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বীরত্বগাথা অনেকেরই অজানা। আমি ১৯৭১ সালে নৌবাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করি। আজ আমি সংক্ষেপে আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধের কিছু অজানা কাহিনী এখানে তুলে ধরলাম।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরুতে আমি ছুটি নিয়ে করাচি থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর আমি আমার ও আশপাশের গ্রামের যুবকদের একত্রিত করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি। পরবর্তীতে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকে আসা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছুকদের নিয়ে আগরতলা যাবার ব্যবস্থা করি। বর্ষা শুরু হলে নৌবাহিনীর একক ইউনিট গঠন সম্ভব হবে ভেবে আমরা তখন আগরতলা শালবাগানে ইস্টার্ন কমান্ডের ট্রানজিট ক্যাম্পে কাজ করা শুরু করি। আগস্ট মাসে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার ইস্টার্ন কমান্ডের ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। এ সময় ক্যাম্পে অবস্থানরত আমরা ৩০-৪০ জন নৌ-সেনা আমাদের জন্য একটা স্পিডবোটের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। কেননা বাংলাদেশের মতো নদীমাতৃক দেশে স্পিডবোটে অত্যন্ত কার্যকর অপারেশন চালানো সম্ভব ছিল। তিনি আমাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই বিভিন্ন সেক্টরে অবস্থানরত নৌবাহিনীর সদস্যদের কলকাতার কল্যাণীতে একত্রিত করা হয়। আমরাও সেখানে পৌঁছে যাই। কিছুদিন পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় গার্ডেন রিচের একটি বাড়িতে। এ সময় ভারতের পক্ষ থেকে আমাদেরকে দুটি টাগবোট (জেটিতে বড় জাহাজকে টেনে আনার জন্য ব্যবহৃত হয়) দেয়া হলো। আমরা রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এ টাগবোট দুটিকে সশস্ত্র গানবোটে রূপান্তরিত করি। এদের একটির নামকরণ করা হয় পদ্মা অপরটির পলাশ।

আমিসহ একটি দলকে অগ্রবর্তী দল হিসেবে ট্রাকযোগে হলদিয়ায় পাঠানো হলো। পরদিন সেখানে হেলিকপ্টারযোগে ভারতীয় নৌবাহিনীতে কর্মরত একজন কমান্ডার এমএন সামন্ত উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ছিল কয়েকজন ভারতীয় আর্মি। তিনি জানালেন, আমাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় আর্মিরা ভিন্ন তাঁবুতে অবস্থান করবে। আর কয়েক দিন পর পর একজন লোক এসে আমাদের খাদ্যসামগ্রী এবং যুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে এমন সব গোলাবারুদ এখানে জমা করে যাবে। তিনি আমাদের সাবধান করে দিলেন যে, আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই আমাদের পরিচয় প্রকাশ না করি।

কয়েক দিনের মধ্যেই পদ্মা ও পলাশকে হলদিয়া পোর্টে হাজির করা হলো। ভারত আমাদের শুধু যুদ্ধজাহাজ, অস্ত্র ও গোলাবারুদই দিল না, সেই সঙ্গে আমাদের দুটি জাহাজের জন্য দু'জন ভারতীয় কমান্ডারকেও নিযুক্ত করলো। যাদের নাম যথাক্রমে লেফটেন্যান্ট মিত্র ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার রায় চৌধুরী। আর এ জাহাজ দুটির কম্যান্ডেন্ট নিযুক্ত হলেন কমান্ডার এমএন সামন্ত। জাহাজের দায়িত্ব পেয়ে তারা এর গুণগতমান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্যে তারা জাহাজ দুটিতে ৮টি ম্যাগনেটিক মাইন স্থাপন করলো। এক-একটি মাইনের ওজন ছিল প্রায় ২৫ মণ। এরপর ভারতীয় নৌবাহিনীর একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ১০ নবেম্বরে রাত ১টার দিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমরা মংলা বন্দরের বহির্নোঙ্গর হিরণ পয়েন্টে পৌঁছি। এ অভিযানে আমাদের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে একটি ভারতীয় ফ্রিগেট। এ সময় জাহাজ দুটির কম্যান্ডেন্ট সামন্ত যেখানে মাইনগুলো ফেলতে হবে, সেসব চ্যানেল চিহ্নিত করে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ত্যাগ করেন। আমরা অত্যন্ত ক্ষীপ্রগতিতে দুটি চ্যানেলে ৮টি মাইন নিক্ষেপ করি। এ সময় ভারতীয় ফ্রিগেট থেকে আমাদের কাছে বার্তা পাঠানো হয় যে ১০ কিলোমিটার দূরে একটি বাণিজ্য জাহাজ মংলা বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা পদ্মা ও পলাশ নিয়ে ৩ কিলোমিটার অগ্রসর হলেই বাণিজ্য জাহাজটিকে দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ আমরা জাহাজটির উদ্দেশ্যে বাফার গান থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকি। আমাদের আক্রমণের মুখে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোনো রকমে তার গতিপথ পরিবর্তন করে পালিয়ে যায়।

তখন পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে আমরা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে সরাসরি যুদ্ধ করতে পারছিলাম না। কিন্তু সে সময় আমরা দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পক্ষপাতি ছিলাম না। আর সে সময় আমরা ভারতীয় কমান্ডারের অধীনে থাকায় চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমাদের ছিল না। তাই আমরা লে. কমান্ডার রায় চৌধুরীর কাছে প্রস্তাব পেশ করলাম যে, আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে একটি অপারেশন চালাতে চাই। তিনি আমাদের প্রস্তাব শুনে বললেন যে, পাকবাহিনীর গানবোট ও পদাতিক বাহিনী অত্যন্ত সক্রিয়, সুতরাং আমাদের স্বল্পগতিসম্পন্ন গানবোট নিয়ে চট্টগ্রাম আউটার চ্যানেল পর্যন্ত হয়তো যাওয়া যাবে, কিন্তু ফিরে আসা সম্ভব হবে না। এ মুহূর্তে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আত্মঘাতী। এই কথার উত্তরে আমি জানালাম, 'আমরা জেনেশুনেই মরতে যাবো, তবে মৃত্যুর আগে চট্টগ্রাম বন্দরের মুখ চিরদিনের জন্য ব্লক করে দিয়ে যাবো।' এ কথা শুনে জনাব রায় অভিভূত হয়ে যান। তিনি বলেন, যে দেশ এমন সাহসী সন্তান জন্ম দিয়েছে, সে দেশ পরাধীন থাকতে পারে না। তোমাদের দেশ স্বাধীন হবেই।

৫ ডিসেম্বর পদ্মা ও পলাশ মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া থেকে হাছনাবাদের উদ্দেশে রওনা হয়। পরদিন ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে আমাদের সঙ্গে অবস্থানরত ভারতীয় অফিসার ও নাবিকরা প্রথমবারের মতো নিজ দেশের সামরিক পোশাক পরিধান করলো। ৬ তারিখেই আমরা সুন্দরবনের অদূরবর্তী হাছনাবাদে পৌঁছি। এ সময় কমান্ডার সামন্ত উপস্থিত হয়ে সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিফিং প্রদান করেন। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল যে, পাকসেনারা খুলনায় এসে জড়ো হচ্ছে। খুলনায় বর্তমানে অবস্থানরত ৩০ হাজার পাকসেনাই আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য। আমরা আমাদের গানবোট দ্বারা তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবো। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে আমরা ৯ ডিসেম্বর বিকালে সুন্দরবনের ভেতরে বিস্তৃত নদীর মধ্য দিয়ে মংলা বন্দরে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু সেখানকার নদী সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় আমাদের অভিযান সফল করার জন্য একজন গাইডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওবায়দুল হক নামে ২০ বছরের এক সাহসী তরুণ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমাদের মংলা বন্দরে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। আমাদের ইচ্ছে ছিল ১১ ডিসেম্বর ভোরে মংলা বন্দর আক্রমণ করবো। কিন্তু সকাল হতেই দেখা গেল যে মংলার আকাশ লাল হয়ে আছে। কারণ মিত্রবাহিনী বিমান থেকে মংলা বন্দরে বোমাবর্ষণ করে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বন্দরে পৌঁছে দেখি বন্দর শত্রুমুক্ত।

আমাদের জাহাজ দেখে বন্দরে অবস্থিত

বাঙালিরা প্রথমে পালিয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু আমরা যখন 'জয়বাংলা' বলে স্লোগান দিলাম, তখন তারা আবার একত্র হয়ে অত্যন্ত আনন্দ উল্লাসের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাগত জানাল। দীর্ঘদিন পর স্বদেশের মানুষ ও আলো-বাতাস পেয়ে আমরাও শিহরিত হয়ে উঠি। আনন্দিত চিত্তে সেদিনই সকালে আমরা খুলনা অভিমুখে রওনা হই। কিন্তু আমাদের সে আনন্দ বেশিক্ষিণ স্থায়ী হয়নি। সকাল প্রায় ১০টার দিকে আমরা খুলনা শিপইয়ার্ড সংলগ্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে মাইকের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলি। প্রায় ৩০ হাজার পাকসেনাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার সেই গৌরবজনক অধ্যায় যখন প্রায় আমাদের হাতের মুঠোয়, সে সময়ই ঘটলো এক দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা, যা ছিল অকল্পনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

সে সময় আমি পদ্মার ব্রিজে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখলাম উত্তর দিক থেকে দুটি জঙ্গি বিমান একটু একটু করে নিচে আমাদের দিকে নেমে আসছে। তৎক্ষণাৎ আমি কমান্ডিং অফিসারকে রিপোর্ট করলাম। তিনি নিজের চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বিমান দুটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, Friendly Aircraft. They will support us if we are attacted. কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই বিমান দুটি ড্রাইভ দিয়ে পদ্মা ও পলাশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে চলে গেল। সেদিন কী কারণে ভারতীয় বিমান বাহিনী এভাবে পদ্মা ও পলাশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা আজ পর্যন্ত অজানা থেকে গেল। পলাশের কমান্ডিং অফিসার খুবই অভিজ্ঞ হওয়ায় ঘাটের কাছাকাছি অবস্থান করায় এবং ব্রিজে বোমার আঘাত না হওয়ায় জাহাজটিকে কোনো রকমে রূপসা ঘাটের তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পলাশে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন। পরবর্তীতে জেনেছি, তিনি আহত অবস্থায় নদীতে পড়ে গেলে রাজাকারদের গুলিতে শহীদ হন। পরে কিছু লোক তাকে রূপসা ঘাট সংলগ্ন স্থানে সমাহিত করেন।

অন্যদিকে গানবোট পদ্মা নদীর মাঝামাঝি স্থানে ছিল। তদুপরি ইঞ্জিন রুম ও কোয়ার্টার ডেক বোমার আঘাতে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অনেকেই প্রাণভয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়ে। আমি অচেতন অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ছিলাম। চেতনা ফিরে এলে আমি দেখতে পেলাম ব্রিজের এক কোনায় কমান্ডিং অফিসার রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। আর আমার সারা শরীরে রক্ত ও তীব্র যন্ত্রণা। আমার পেছনে ব্রিজের মধ্যে পতাকা রাখার ডেস্কের নিচে দেখলাম গাইড ওবায়দুল রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার একটা উরু বোমার আঘাতে থেঁতলে গেছে। ফলে সে নড়ার বা চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। সে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মুহূর্তে আমি আমার নিজের যন্ত্রণা ভুলে জাহাজের পতাকা দিয়ে তার ক্ষতস্থানে প্রাথমিক পরিচর্যা করার জন্য হাত বাড়াই। কিন্তু তখনই ইঞ্জিন রুম থেকে আসা আগুন পতাকাসহ চারপাশের সবকিছুতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সে আগুনের লেলিহান শিখা ওবায়দুলের গায়েও ছড়িয়ে যায়। আগুন যখন আমার দেহ স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, তখন আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

তীব্র স্রোতের কারণে যতই উজানের দিকে যেতে চাচ্ছিলাম, আমি ততই ভাটির দিকে চলে যাচ্ছিলাম। সুতরাং আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটতে লাগলাম। এদিকে বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত আমার বাম হাত ও গলায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে আল্লাহকে স্মরণ করে তীরের দিকে এগোতে লাগলাম। অবশেষে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। কারণ পরবর্তীতে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের হাতে ধৃত হয়ে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছি। সে অধ্যায় আজ আর এ স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে কোনো এক সময় সুযোগ হলে সবার সামনে তা তুলে ধরবে।

বাড়ী নং ২৪২/২, আদর্শ রোড
সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

মুক্তিযুদ্ধ ও আত্তাহিয়াতো

আব্রাহাম চৌধুরী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্য সমস্ত ইতিহাস বা ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরনের ইতিহাস। এই যুদ্ধে অনেক বীর সন্তান রয়েছেন, যাদের কোনো রকমের ট্রেনিংই ছিল না। এদের অনেকেই নরম হাতে শক্ত অস্ত্র ধরেছিলেন। আবার অনেকেই ঐ অস্ত্রধারীদের সহায়তা দিয়েছিলেন। সাহস দিয়ে বা ছোটখাটো গোপন সংবাদ সরবরাহ করে। এই যোগ্য সন্তানদের কেউ হয়তো বা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন আর কেউ হয়তো পাননি। আবার অনেকেই সময় ও সুযোগ বুঝে সুনাম বা দুর্নামের পরোয়া না করে বুঝে নিয়েছেন নিজের আখের।

একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি। যে সময়ে বা স্থানে বসে এ লেখাটি লিখছি সেটি হচ্ছে শীতকাল। এ সময়ে সপরিবারে আমি রয়েছি সূর্য উদয়ের দেশ জাপানে। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাস। বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। ভয়ানক শীত। হিমাঙ্কের নিচে, ১০° (মাইনাস ১০°)। দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর রাতের খাবার খেতে বসেছি আমি, আমার স্ত্রী, বড় ছেলে। ঠিক ঐ সময়ে আমার ছোট ছেলে এক কপি সাপ্তাহিক ২০০০ আমার হাতে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখার আহ্বানটি দেখিয়ে বললো 'লিখ না ড্যাডি তোমার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির কথা'। সঙ্গে সমর্থন দিল আমার বড় ছেলে। এটি ছিল একটি ছোট্ট অনুরোধ। পিতার প্রতি সন্তানের আর দশটি অনুরোধের মতই একটি অনুরোধ। না, এটি সে অনুরোধ নয়, এটি একটি দাবি। একটি আত্ম-গৌরবের দাবি। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হওয়ার কি যে আনন্দ, কি গর্ব এবং শান্তি সে দিন আমি দেখিছি। আমি দেখেছি তাদের চোখে মুখে আর অনুভূতিতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এর চেয়ে আনন্দ বা শান্তি আর কি আছে। আমার যা পাওয়ার তা আমি পেয়েছি। আর তাই পরম উৎসাহ নিয়ে হাতে কলম ধরেছি। এরপরেও কথা থেকে যায় মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত ঘটনা সত্যি কি লিপিবদ্ধ করা যায়! না যাবে? সে উত্তর মুক্তিযোদ্ধারাই দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। আমি ভোলা শহরের সন্নিকটে আলগী গ্রামের বাসিন্দা হলেও অধ্যয়ন করেছি চরফ্যাশন কলেজে। ঐ ভয়ঙ্কর সময়ে স্কুল, কলেজ তথা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ ছিল। জাতি তখন এক সংকটকাল অতিক্রম করছিল। ঐ সময়টি বাড়িতে বসে না কাটিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি জাতির এই দুর্যোগে কি করা যায়। শহরে যাওয়া যদিও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তবুও যেতাম বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে এবং গোপনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা করতে। ভোলা টাউন স্কুলের পূর্ব পার্শে খালের ওপারে মাকসুদ ভাইয়ের বাড়িতে আলোচনায় বসতাম। এখানে অনেক লোকেরই সমাগম হতো। এ বাড়িতেই আলম ভাই নামে একজন উঁচু-লম্বা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার কাছেই পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির বিষয়ে জানতে পারি। তারপর থেকেই শুরু হয় সংগঠনের কাজ। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ প্রশিক্ষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। এর জন্য ভোলার প্রতিটি থানায় এবং অনেকগুলো ইউনিয়নে যেতে হয়েছে আমাকে। এখন ভাবতে অবাক লাগে ঐ সময় এতো সাহস এতো উদ্যম কোত্থেকে পেয়েছিলাম। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারতো মারাত্মক অঘটন। শহরে, রাস্তা ঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে দেখা হতো। এর পরেও ছিল তাদের পা-চাটা গোলাম-দালাল রাজাকার আল-বদর এবং শান্তি বাহিনী।

চরফ্যাশন কলেজের ছাত্র ছিলাম বলে ঐ এলাকার পার্টির সংগঠনের দায়িত্ব আমার উপরেই ন্যস্ত হয়। এর জন্য অনেকবার ভোলা হতে চরফ্যাশনসহ বিভিন্ন থানায় আমাকে যেতে হয়েছে। কলেজের Identity

Cardটি সর্বদাই সঙ্গে রাখতাম। একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। এটি হচ্ছে আত্তাহিয়াতো সম্পর্কিত ঘটনা। দিন বা তারিখ আজ আর মনে নেই। ভোলা থেকে চরফ্যাশনের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। তখন ভোলা থেকে চরফ্যাশন যে বাসগুলো যেতো, সেগুলো ছিল ঠিক মুড়ির টিনেরই মতো। ড্রাইভারের পিছনে আবার এক ধরনের কেবিনও ছিল। ভাড়া সামান্য একটু বেশি। সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে ড্রাইভারের পিছনে অর্থাৎ কেবিনে বসলাম। আমাদের বাসটি বোরহানউদ্দিন এসে পৌঁছলে চরফ্যাশন কলেজের একজন হিন্দু ছাত্র বাসে উঠলো এবং ঠিক আমার পাশের সিটেই বসলো। তার নাম গোপাল দাস। উভয়ে কুশল বিনিময় করলাম। ওর সঙ্গে অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হলো। দুজনে বেশ আলাপ জমে উঠলো। একঘেয়েমি কেটে গিয়ে সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। ইতিমধ্যেই বাসটি লালমোহন শহরে এসে পৌঁছেছে। সামনে পাকিস্তানি আর্মি গাড়ি। আমাদের বাসটিকে থামার নির্দেশ দেয়া হলো। বাসে কোনো হিন্দু তথা কাফের বা কোনো দুষ্কৃতকারী আছে কিনা চেক করা হবে। বাসের সামনে ৩ জন আর্মি অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ২ জন দালাল এবং ২ জন আর্মি আমাদের বাসটি চেক করতে শুরু করলো।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু তথা কাফের চেক করার উপায় হিসাবে মানুষকে লেংটা করার পরিবর্তে 'কলেমা' মুখস্থ করতে বলা হতো। তাই জান বাঁচানো ফরজ মনে করে অনেক হিন্দু ভাইয়েরাও কলেমা মুখস্থ করে নিয়েছিল। ঐ পাকিস্তানি বর্বরগুলো ও তাদের পা-চাটা তাবেদার দালালদের এই জ্ঞান ছিল না মুখে কলেমা উচ্চারণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। ধর্ম বিশ্বাস হলো সম্পূর্ণ অন্তরের বিষয়। কলেমা শুধু মুখ দিয়ে বলার বিষয় নয় বা উচ্চারণ করার বিষয়ও নয়। কলেমা হচ্ছে মনে প্রাণে অধ্যয়ন বা উপলব্ধি করার বিষয়।

সে দিন যখন আমাদের বাসটি চেক করা শুরু হলো তখন মনে প্রাণে পরম করুণাময়কে স্মরণ করতে শুরু করলাম। আমার হয়তো বা কিছুই হবে না। কিন্তু দুশ্চিতা হচ্ছিল আমার পাশে বসা, আমারই কলেজের ছাত্র হিন্দু ছেলেটির কি হবে। ওরা তো ধরে নিয়ে যাবে অভাগা গোপালকে। সে দিন চেক করার ধরন ছিল একটু অন্য রকমের। তাঁবেদার দালালরা সবাইকে জিজ্ঞাসা না করে যাকে তাদের সন্দেহ হচ্ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো। আর অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিল সেদিন কলেমা জিজ্ঞাসা না করে 'আত্তাহিয়াতো' বলতে বলা হচ্ছিল। ঐ জানোয়ারগুলো তা হলে জানতো যে প্রাণের ভয়ে হিন্দুরাও কলেমা মুখস্থ করে মুসলমান সেজে জান বাঁচাতো। আর তাই সেদিন কলেমার পরিবর্তে 'আত্তাহিয়াতো' বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঐ পাষন্ড বর্বররা কি জানতো না যে শতকরা কতজন মুসলমান ঠিক করে আত্তাহিয়াতো মুখস্থ বলতে পারে।

আর যদিও বা মুখস্থ থাকে ঐ রকম একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে এবং পরিবেশে কতজন মুসলমান 'আত্তাহিয়াতে' ঠিক করে বলতে পারে। জোর করে রাস্তায় বাস থামিয়ে যাত্রীদিগকে 'আত্তাহিয়াতো' জিজ্ঞাসা করা ধৃষ্টতা কোন ইসলামিক শাসনতন্ত্রে আছে!

গোপালের ভাগ্য ভালো ছিল। ওকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বেঁচে গেলো গোপাল। বাসে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলাম। ৪ জন হতভাগা 'আত্তাহিয়াতো' বলতে পারেনি। জালেমরা সেই ৪ জনকে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলো। ধরে নিয়ে যাওয়া সেই ৪ জন বাসযাত্রী যে হিন্দু ছিল তা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সে দিন তাদের ভাগ্যের পরিণাম কি হয়েছিল তা আর জানতে পারিনি

বাসটি জোর করে থামিয়ে যাকে ঐ মূর্খদের ইচ্ছে তাকেই 'আত্তাহিয়াতো' মুখস্থ বলতে বলা হলো। আমাকেও বলতে বললো। আমি ভয়ে ভয়ে অনেক কষ্ট করে কোনো রকমে বলতে পারলাম। গোপালের ভাগ্য ভালো ছিল। ওকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বেঁচে গেলো গোপাল। বাসে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলাম। ৪ জন হতভাগা 'আত্তাহিয়াতো' বলতে পারেনি। জালেমরা সেই ৪ জনকে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলো। ধরে নিয়ে যাওয়া সেই ৪ জন বাসযাত্রী যে হিন্দু ছিল তা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সে দিন তাদের ভাগ্যের পরিণাম কি হয়েছিল তা আর জানতে পারিনি। গোপাল যদিও চরফ্যাশন যাওয়ার যাত্রী ছিল, প্রাণের ভয়ে লালমোহন থেকে কিছুদূর এলেই সে বাস থেকে নেমে গেল।

এদিকে অন্যান্য স্থানের মতো ভোলাতেও স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বেড়ে গেলো। দালালদের সহযোগিতায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিশেষ করে যুবক নিধনও অত্যধিকভাবে বেড়ে গেলো। টাউন স্কুলের কাছে সেই মাকসুদ ভাইদের বাড়িতে আলোচনা বন্ধ করে দিতে হলো। অস্থায়ীভাবে আলগীতে আমাদের বাড়িতে আলোচনার স্থান করা হলো। আমাদের ধনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন ইলিয়াস মাস্টার। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্থানীয় দালালরা তাকে শান্তি বাহিনীর চেয়ারম্যান বানালো। সেই ইলিয়াস মাস্টারের নেতৃত্বে বেয়নেটের খোঁচায় অনেক জীবনই অকালে নিঃশেষ হয়েছে।

অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ সংগ্রহ করার জন্য আমরা সচেষ্ট ছিলাম। বোমা বানাতে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন। জানতে পারলাম ভোলা কলেজের সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে। তাই আলম ভাইয়ের নেতৃত্বে আলগীর রফিকসহ (শহীদ) আমরা ৫ জনে মিলে একদিন রাত ১১টার দিকে কলেজের সায়েন্স ল্যাবরেটরির তালা ভেঙে লুট করলাম। পেলাম ২ কেজির মতো Potassium Caloride।

ভোলার উত্তরে পরানগঞ্জ গ্রাম। ঐ গ্রামের তালুকদার বাড়িতেও একজন শান্তি বাহিনীর নেতা ছিলো। পাকিস্তানিরা তার নিরাপত্তার জন্য তাকে একটি পিস্তল দিয়েছিল। সুযোগ বুঝে তারই আত্মীয় লিয়াকত সেই পিস্তলটি চুরি করে পার্টিতে জমা দিয়েছিল। নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করে বাউফলের সংগঠনের হেফাজতে লিয়াকতকে পাঠানো হয়েছিল।

এরই মধ্যে সামান্য কিছু অস্ত্র আমাদের হাতে এসে গেলো। আমার কাছে থাকতো ১টি রিভলবার ও একটি গ্রেনেড। আর রফিকের (শহীদ) কাছে থাকতো ১টি গ্রেনেড।

এক সন্ধ্যায় চরফ্যাশন থেকে জাকির খবর পাঠালো তাড়াতাড়ি ওখানে যাওয়ার জন্য। বুঝতে পারলাম অপারেশন হবে। রাত ১০টার দিকে খবর পেলাম। রফিক (শহীদ) ছাড়া আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাবো। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। বাসে যেতে সাহস হলো না। ঠিক করলাম মেইন রোডে না গিয়ে বেড়িবাঁধ ও অন্য ছোটখাটো রাস্তায় যেতে হবে। আগেই লিখেছি সংগঠনের কাজে ভোলার সব কয়টি থানা এবং এবং অনেকগুলো ইউনিয়নে আমাকে যেতে হয়েছে। সে সুবাদে চরফ্যাশন যাওয়ার আঁকা-বাঁকা রাস্তাগুলোও আমার মোটামুটি জানা ছিল।

ভোর রাত ৪টার সময় সাইকেল দিয়ে ভোলা থেকে চরফ্যাশনের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সাইকেলের ক্যারিয়ারের ব্যাগের মধ্যে রয়েছে ১টি রিভলবার ও ১টি গ্রেনেড। মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েক মাস আগে ভোলাতে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। তাতে বেড়ি বাঁধের অনেক স্থানই ভেঙে গিয়েছিল।

সাইকেল নিয়ে যাওয়াটা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। পথে কয়েকবার বিশ্রাম ও চা-নাস্তা সেরে নিয়েছি। অবশেষে বিকাল ৩টার দিকে ৪৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে চরফ্যাশন বাজারে জাকিরদের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম সেরে সন্ধ্যার পরে আমি এবং জাকির প্রায় এক ঘন্টা পায়ে হেঁটে বাজারের পূর্ব দিকে এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এখানে এসে ভোলার তালুকদার বাড়ির লিয়াকতকে দেখে আনন্দে বুকটা ভরে গেলো।

পরের দিন সকালে আলোচনায় বসলাম। আমাদের ১৫ জনের অস্ত্রধারী একটি সক্রিয় সংগঠন। অস্ত্রগুলোর কথা আজো মনে রয়েছে। ৫টি ৩০৩ (থ্রি নট থ্রি) রাইফেল, ৩টি পিস্তল, ১টি রিভলবার, ৩টি গ্রেনেড, ২টি হাতবোমা, কয়েকটি বেয়নেট ও চাকু। কিছুক্ষণ অস্ত্র প্রশিক্ষণও হলো। জানতে পারলাম ঐদিনগুলোতে চরফ্যাশন থানাতে কোনো পাকিস্তানি বাহিনী রাতে অবস্থান করতো না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো সে রাতেই থানা

আক্রমণ করা হবে।

রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম যেন রাত আরো গভীর হয়। তারপর অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বেশি দেরি হলো না। রাত বারটার সময় বের হয়ে পড়লাম ১৫ জনের একটি সক্রিয় শক্তি। বাড়ির সবাই চোখের জলে ভগবানের নাম নিয়ে আমাদের বিজয় কামনা করে বিদায় দিল। অন্ধকার রাত। অতি সাবধানে, নিঃশব্দে, ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে হেঁটে চললাম বিজয়ের লক্ষ্যে। রাত প্রায় ১ টার দিকে চরফ্যাশন থানার পূর্ব পার্শে এসে পৌছালাম। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো নিষ্প্রয়োজনে আমরা একটি গুলিও করবো না। পরিকল্পনা অনুসারে অতি সতর্কতার সঙ্গে খুব দ্রুত চতুর্দিক থেকেই থানাটি ঘেরাও করে ফেললাম। আমার হাতে স্টেনগান, লিয়াকতের হাতে ১টি পিস্তল ও সঙ্গে ১টি গ্রেনেড আর জাকিরের সঙ্গে রয়েছে ২টি হাতবোমা। থানার চারদিকে রয়েছে আরও ৫ জন অস্ত্রধারী মুক্তিফৌজ এবং প্রতিজনের সঙ্গে রয়েছে একজন করে সহযোগী। আর রয়েছে মনোবল।

থানার গেটের একটু ভেতরে একজন সেনট্রি অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ করেই একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা ৩ জন। সেনট্রিকে কিছু বলার বা করার সুযোগ দিলাম না। তাকে লক্ষ্য করে একটু জোরেই বললাম, 'আমরা মুক্তিফৌজ, থানার চারদিকে আমরা পজিশন নিয়ে ফেলেছি। আপনারা সারেন্ডার না করলে আমরা থানাটি উড়িয়ে দেব।' সেনট্রি এমন একটি পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। সে জড়সর এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললো, 'দাঁড়ান' (অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করুন)। এরই মধ্যে বন্দুকধারী আরও একজন সেনট্রি সামনে এগিয়ে এলো। মনে হলো সেও আমাদের কথা শুনছিল। তাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখলাম। বলা তো যায় না যদি আক্রমণ করে বসে। এরই মধ্যে আমাদের আরও দুজন কাছে এসে পড়েছে। লিয়াকত সেনট্রি দুজনকে বললো, আপনাদের রাইফেল ২টি দিয়ে দিন। বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজন এগিয়ে গিয়ে খুব সহজভাবেই রাইফেল ২টি নিয়ে নিল। জাকির থানার বাইরের আমাদের বাহিনীর সবাইকে ভেতরে নিয়ে এলো। ওরা আত্মসমর্পণ করলো। থানায় ২০টি ৩০৩ (থ্রি নট থ্রি) রাইফেল এবং প্রায় ৩০০০ গুলি পেলাম। জাকিরের নেতৃত্বে থানার সামনে তিনজন পাহারাদার দাঁড়া করালাম। গোটা কাজট প্রায় ১ ঘন্টার মধ্যেই সেরে নিলাম। কোনো ঝামেলাই হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে দখল করে নিলাম চরফ্যাশন থানা। খুব গর্ববোধ করলাম নিজেদেরকে নিয়ে। গর্ববোধ করলাম আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী পুলিশদের কথা মনে করে। সবাই আনন্দিত আর উল্লসিত। লিয়াকত আমাদের প্রত্যেককে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে স্বাধীনতার আনন্দ ঘোষণা করতে বললো। তাই করা হলো। গুলির আওয়াজ শুনে গভীর রাত হলেও বাজারের কিছু লোক জমায়েত হয়ে গেলো অভ্যর্থনা জানাতে। কেউ কেউ কাছে এসে হাত এবং বুক মিলিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করলো।

কোন দিকে থেকে কোন বিপদ এসে পড়ে বলা তো যায় না। তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কেটে পড়তে হবে। থানার পাশেই রয়েছে খাল। ছইযুক্ত ২টি নৌকা সংগ্রহ করা হলো। অস্ত্র এবং আমাদের মুক্তিফৌজ নিয়ে নৌকা পাড়ি দিলাম। স্থানীয় লোকদের জানতে দিলাম না, আমাদের গন্তব্য স্থান। চলে এলাম বাউফল থানার একটি গোপন ঘাঁটিতে।

এখানে ঘটলো একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইতিমধ্যেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তি বাহিনীরা এসে গেছে। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের আলোচনা হলো। এক পর্যায়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বার্থে এবং সমূহ সংঘর্ষ এড়াতে আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে হস্তান্তর করা হলো। বিষয়টি ছিল খুবই বিতর্কিত। ঐ বিশেষ অবস্থায় 'অস্ত্র হস্তান্তর' ছাড়া আর কোনো বিকল্প বিশ্লেষণ বা ব্যবস্থা ছিল না।

স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সংগঠনের কাজে বেশ কয়েক দিন কাটানোর পর এক রাতে নিজের বাড়ি অর্থাৎ আলগীতে ফিরে এলাম।

আমাকে দেখামাত্র বাবা-মা, ভাই-বোন কেঁদে ফেললো। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে জানতে পারলাম কে যেন এসে বাবাকে বলে গেছে, চরফ্যাশন থানা দখল করার সময় প্রচুর গোলাগুলি হয়েছে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আমি মারা গেছি। সে নিজেই নাকি আমার মৃতদেহ দেখে এসেছে। গুজব আর কি! না, আমি মারা যাইনি। সুস্থ, সবল এবং প্রচুর আনন্দসহ পরিবারের সবার মাঝে ফিরে এসেছি।

কিন্তু আমার সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়ে গেলো। হয়তো বা কোনো মুক্তিযোদ্ধাই মুক্তির আনন্দ পুরোপুরি ভোগ করতে পারে না। আগেই উল্লেখ করেছি, আমার বন্ধু রফিকের (শহীদ) কাছে ১টি গ্রেনেড ছিল। আমি তো চরফ্যাশন অপারেশনে চলে গেলাম। এদিকে ভোলা শহর এবং শহরতলীতে পাকিস্তানিদের অত্যাচার আরো বেড়ে গিয়েছিল। দালালরা মরিয়া হয়ে উঠলো। আমাদের ধনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কুখ্যাত ইলিয়াছ মাস্টারের সুপারিশে অনেক স্বাধীনচেতা যুবককে বাড়িবাড়ি থেকে ধরে এনে শারীরিক নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আর সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল সহজ-সবল সেই শহীদ রফিকুল ইসলাম। ইলিয়াছ মাস্টারের ভোলা শহরেও একটি অফিস ছিল। হয়তো তাকে মারার পরিকল্পনা করেছিল রফিক। সে নাকি একটি গ্রেনেড নিয়ে তার অফিসের সামনে আনাগোনা করছিল। ঐ সময় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দালাল ইলিয়াছ মাস্টারকে পাহারা দিচ্ছিল। রফিকের গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধরে ফেলে। গ্রেনেড নিক্ষেপ করার সুযোগ আর সে পায়নি। দেহ তল্লাশি করে তার কাছে গ্রেনেডটি পেয়েছিল। রফিকের ওপর কঠোর শারীরিক অত্যাচার চালায় পাকিস্তানিরা। তাদের অত্যাচারে শহীদ হয়েছে রফিক। পরবর্তীতে তার স্মরণার্থে সরকারের নির্দেশে আলমীর রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছিল 'শহীদ রফিকুল ইসলাম সড়ক'। না 'শহীদ রফিকের' নাম কেউ স্মরণ রাখেনি। এই লেখাটি লেখার সময় রাস্তাটির বিষয়ে জানার জন্য জাপান থেকে ভোলায় ফোন করেছিলাম। কিন্তু রাস্তাটির নাম যে শহীদ রফিকের নামে নামাঙ্করণ করা হয়েছিল তা অনেকেই জানে না। হয়তো বা কোথাও কোনো সাইনবোর্ড নেই। এমনিভাবেই হয়তো অনেক শহীদ বা মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, ঠিকানাও ইতিহাসের পাতা থেকে ইতিমধ্যেই মুছে গেছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করবে তা নির্ভর করবে বর্তমান প্রজন্মের ওপর। প্রতিজন মুক্তিযোদ্ধা নিঃস্বার্থেই জাতির মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল। পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই- A freedom fighter is a lord of all, subject to none, A freedom fighter is a servant of all, subject to all. এটাই হচ্ছে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার প্রকৃত গৌরব।

Yamanashi-Ken, Tsuru-city
Igura 51-3-402, Japan
abrahamjpn@yahoo.com

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নপুরুষ

রণজিৎ কুমার সেন

১৯৭১ সাল। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় কাল। প্রিয় জন্মভূমি থেকে স্বৈরাচারের অনুচর-অনুসারীদের উৎখাতের প্রয়োজনে বীর মুক্তিসেনারা শক্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল জাতির জনকের উদাত্ত আহ্বানে। বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামীরা মরণ-বাঁচন লড়েছিল অকুতোভয় এক দৃঢ় শপথ নিয়ে- মরব, দেশ স্বাধীন করবো। দিন যায়, মাস যায়, বছর না গড়াতেই এগার মাসে উৎসাহী দামাল ছেলেরা অস্ত্রের মাথায় জাতীয় পতাকা গেঁথে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সসম্মানে পবিত্র মাতৃভূমিতে ফিরে মাথা ছোঁয়ায়। উদ্ধার হলো

স্বাধীন বাংলাদেশ, আর আমরা এ দেশেরই উত্তরসূরি নাগরিক।

সেই সময় আমরা নারায়ণগঞ্জে বসবাস করতাম। একনাগাড়ে ৪৮ বছর নগর খানপুর মেইন রোডের পাশে এক দোতলায় কাটিয়ে যুদ্ধকালীন শান্তিবাহিনীর রোষানল থেকে বাঁচার জন্য ঢাকায় চলে আসি। তখন আমাদের যৌথ পরিবারের অর্ধেক সদস্য চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট গ্রামের বাড়িতে। সেখানে তারাও নিরাপদে ছিল না। দিনের বেলায় এক উদার মুসলিম পরিবারের আর্থিক ও কায়িক সহযোগিতায় পূর্বদিকে করলডেঙ্গা পাহাড়ে চলে যেত এবং সন্ধ্যার আগে বাড়িতে নেমে আসতো। বর্ষীয়ান জেঠামশাইকে ঈশ্বরখাইনের এক উঠতি রাজাকার হাবু জোর করে ধরে নিয়ে কৃষ্ণাকালী খালের ওপর, ডেঙ্গাপাড়া লম্বা কাঠের পুলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে মারার জন্য উদ্যত হলে, আমাদের গ্রামেরই পুতুল দস্তিদার নামে এক সাহসী মুক্তিযোদ্ধা পেছন থেকে এসে জেঠামশাইকে সরিয়ে নিয়ে পিস্তল দিয়ে পরপর কয়েকটা গুলি করে হাবুকে খালে ভাটার টানে ফেলে দেয়। চারদিকে ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। সে সময় গ্রামের সঙ্গে আমাদের ছিল না কোনো রকম যোগাযোগ। একমাত্র কলকাতা নিবাসী আমার এক কনিষ্ঠ সহোদর তার লন্ডন প্রবাসী এক বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ করতো। আমাদের হাতে লেখা চিঠি দেখে সব জানতে পারতো এবং আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল শরণার্থী হয়ে আগরতলা চলে যেতে, তারপর অন্য ব্যবস্থা হবে। আমার জেঠাতো ও আপন ভাই মিলে ছয়জন ভারতীয় নাগরিক। উন্নত চাকরির সুবাদে সবাই ভালোই আছে। আমাদের ভরণপোষণের ভার তারা নেবে। এদিকে আমি সরকারি চাকুরে এবং এক জেঠাতো বড় ভাই ব্যবসা করে। এভাবে ছিন্নবিচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় ভেবে আমরা নারায়ণগঞ্জবাসীরা বাসার সামনে শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে, নিচতলার প্রতিবেশী শ্রদ্ধেয় হাকিম সাহেবের সৎ পরামর্শে বাসা ও বাড়ির মায়া ত্যাগ করে চোখ থেকেও অন্ধের মতো বাঁচার জন্য গন্তব্যের পথ ধরলাম।

নারায়ণগঞ্জ শহরে তখন বিক্ষিপ্ত হামলা চলছে। টানবাজারের এক অবাঙালি ব্যবসায়ী তৈয়ব কাপাড়িয়ার নেতৃত্বে একদল বাঙালি-অবাঙালি সুযোগসন্ধানী চামচা দলভুক্ত করে এবং সেই দিনই টানবাজারে অবস্থিত বাঙালি মালিকাধীন আশা সিনেমা হলের মালিক মহসীন সাহেবের এক ছেলেকে হত্যা করা হয়। লাশ হাসপাতাল থেকে এনে মাসদাইর কবরস্থানে নিতে পারলো না। শেষে নিয়ে গেল নদীর ওপারে নবীগঞ্জ কবরস্থানে। তখন আমরাও নদী পার হচ্ছিলাম কোষা নৌকায় বরফকলের ঘাট দিয়ে। লাশবাহীদের সঙ্গে মিশে গেলাম। মাথার ওপর দিয়ে শত্রুপক্ষের মেশিনগানের গুলি উড়ছে। লাশ বহনকারী সংখ্যার অপ্রতুলতায় কী মনে করে আমিও সাহায্য করতে হাত লাগালাম। কেউ কেউ বাঁশ নিয়ে যাচ্ছিল। নদী পার হয়ে দুই কাঁধে দুই মোটা বাঁশ নিয়ে পিছু পিছু চললাম। আমরাও নবীগঞ্জ হয়ে বৈদ্যেরবাজার দিয়ে মেঘনা পার হয়ে রামচন্দ্রপুর যাব রিফিউজির কাতারে মিলে। ওখান থেকে লোকমুখে সোনা আগরতলা যাওয়া সহজ। এ কথার বাস্তব প্রমাণ পেলাম, কয়েকজন পরিচিত হিন্দু-মুসলিম যুবক আগরতলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে আসছে। তারা নিরাপদে আসা-যাওয়া করে। পথে সাহায্য-সহযোগিতা পায়। পকেটে দেখে অর্থ সম্বল যা ছিল তা থেকে পথে রুটি-কলা-চা খেয়ে কাটিয়েছি। এবং যারা পথে মরে পড়ে আছে তাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি- হে প্রভু এদের আত্মার যেন সদগতি হয়।

রামচন্দ্রপুর আমরা যে বাড়িতে অস্থায়ী আশ্রয় নিয়েছিলাম, তত্ত্বাবধায়ক মালিক ছিলেন সাধু অনিল রায়। ধর্মপ্রাণ সাত্ত্বিক মানুষ। বেশ ভালো পরিবেশের মধ্যে দুর্যোগের দিন কাটছিল। কিন্তু মন থাকতো বাড়ির সংবাদ প্রাপ্তির জন্য। হাহতোস্মি দৈনিক পত্রিকা নেই, স্থানীয় রেডিও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে না। কাজেই বিবিসিনির্ভর ছিলাম এবং অজাতশত্রু ভারতের ওপর। ভারতের ওপর নির্ভর করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রের খবরাখবর এবং 'চরমপত্র' শুনে।

এখানেও বেশি দিন থাকতে পারলাম না। কামাল্লার দিক থেকে প্রায় সময় পাকিস্তানি জান্তা পদব্রজে কিংবা শীর্ণ ধীরস্রোতা তিতাসের বুক চিড়ে লঞ্চে চড়ে কোনো কোনো দিন নির্বিচারে গুলি করতো দুই কূলের দিকে। স্থানীয়-অস্থানীয় সবাই নিশ্চিত মৃত্যুভয় করে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে। অনিল বাবু নিজেদের চেয়ে আমাদের জন্য বেশি উৎকণ্ঠায় থাকতেন। অবশেষে আমি আগরতলা যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত। দাদা এমনিতেই নার্ভাস। একদিন অনিল বাবু ঝাড়ু মিয়া নামে এক বিশ্বস্ত নৌকা মাঝিকে ঠিক করে দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন তার এক বিধবা আত্মীয়ের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে। নিরাপদে সেখানে পৌঁছার পর ভদ্রমহিলা স্থানীয় দালাল ঠিক করে আগরতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমরা পৌঁছে চিরকূট লিখে দিলে দালালরা ফিরে এসে এখান থেকে উপযুক্ত প্রাপ্য পাবে। ভদ্রমহিলা একটি কাগজে আমার কয়েকটি দস্তখত নিয়ে রেখেছেন।

আমরা যখন সিএন্ডবি রোড ক্রস করছিলাম তখনও গা-ভাসা ঊষা। দালালদের নির্দেশে মাথা নিচু করে রাস্তা পার হয়ে অনেক নিচে নামলাম। পার হলাম এক শুকনো খাল। এক ডুবো নৌকা ভাসিয়ে দড়ি বেঁধে দালালরা আমাদের পার করে দিলে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার দু'বছরের পুত্র দাদা ও খুড়াতুতো ভাই নীলুর কাঁধে কাঁধে। স্ত্রী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিপদ আর কাকে বলে। চারদিকে এতো অসহায়ত্তের মাঝে আমরা জলে ভাসা ফাতনা। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন পার্শ্ববর্তী সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় মুক্তিসেনাদের ছোকড়া দালালরা অভয়বাণী শোনাতো- ওরা আমাদের লোক। শরণার্থীর কাফেলা যাতে রাস্তা অতিক্রম করতে পারে নিরাপদে অভয় সংকেত দিচ্ছে। শত্রুসেনা এদিকে আসে না।

পথ চলতে চলতে ক্ষুধায় কাতর হলে দালালদের এক লোক এক গাছ থেকে পাকা কাঁঠাল ছিঁড়ে এনে ভেঙে সবাইকে খাওয়াল। ছেলের জন্য ফ্লাক্সে গরম দুধ ভরে নেয়া হয়েছে। পথের ধারে কার বাড়ির কার ফল কে খোঁজ রাখে। ক্ষুধার্ত মানুষের সেবায় নিবেদিত। বাতাসে যেন ভাসছে, হে দূরাগত পথিকজন, করে চলো নিঃসন্দেহে ভোজন। কতো উদার উচ্ছ্বাসতা।

কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী (বিএসএফ) ক্যাম্প। উর্দু কথা তো জানি। ভাঙা ভাঙা শব্দে রিফিউজি বোঝানোর পর গাড়ির ব্যবস্থা করলো। গাদাগাদি করে জনা বিশেক বসলাম জলপাই ত্রিপলবেষ্টিত এক জিপের ভেতরে। দালালদের চিরকূট লিখে দিয়েছি, চলে গেল। আমাদের নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল আগরতলা রিফিউজি ক্যাম্পের দিকে, শহরতলীতে। প্রাণকেন্দ্রে এসে নামলাম দুপুরের দিকে। ক্যাম্প মেইন রোডের পাশে। অপর পাশে জিপিও। তার সঙ্গে লাগোয়া দোতলা এক দালানে আওয়ামী লীগের অফিস। সেখান থেকে আমাদের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে আনতে বললেন এক ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে নামতেই দেখা হলো নারায়ণগঞ্জ শহরের নগর খানপুর এলাকার প্রতিবেশী নিভাদার সঙ্গে। তিনি বললেন, আপাতত তার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে, বিশ্রাম নিতে। তিনি সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন রাজবাড়ীর জগন্নাথ মন্দিরে। ওদিকে স্ত্রী জিপিওর সিঁড়িতে বসে, কারো কাছ থেকে খুঁজে আনা কেরোসিনের স্টোভে ছেলের জন্য সাগু জ্বাল দিচ্ছে। নীলু সঙ্গে, দাদা ঢুকেছে ক্যাম্পের অবস্থা দেখতে। নিভাদার ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে রাখা, আপদে-বিপদে সাহস-ভরসা পাবে। দাদা ফিরলে সবাই নিভাদার সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। খাওয়া-দাওয়া আর কী, দুপুরে চিড়া ভিজিয়ে গুড়-কলা মিশিয়ে একত্রে বসে খেলাম। রাতের ব্যবস্থা পরে দেখা যাবে।

আমাদের কষ্টের কথা ভাববার আগে বারবার মনে পড়ে রণাঙ্গনে নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। ওদের সমষ্টিগত কর্মকান্ডের কথা চিন্তা করলে রাতে ঘুম হয় না, গা দিয়ে ঘাম ঝরে। সেই বিবেচনায় আমরা তো মহাসুখে। আরামে যদিও নিজের সম্বলে চলি। তবুও বাড়তি উপার্জন আছে রিফিউজি কার্ড। বিপদে দুর্লভ সম্পদ।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভাইদের তার বার্তা পেয়ে, একমাস আগারতলা বিশ্রাম নিয়ে, ধর্মনগর করিমগঞ্জ হয়ে, রেলপথে আসাম রাজ্যের রাজধানী গৌহাটিতে চলে এলাম তল্পিতল্পা নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি ধমনীতে বহমান। শীর্ণ শরীর কল্পনায় ভাবনায় ঝঙ্কারিত হয় সব সময়।

বড়দার রেলওয়ে কোয়ার্টারে একদিন রাত ১২টায় এসে উঠলাম। আমাদের জড়িয়ে ধরে বড়দার কী কান্না। বাড়িতে ছেড়ে আসা

সদস্যদের জন্য দুঃসহ ভাবনা। একে একে সবার বীভৎসতার রূপ ঘষেমেজে সাফ করা হলো। পাগলের ন্যায় উন্মাদ চেহারার চুল-দাড়ি কেটে স্বাভাবিক পর্যায়ের মানুষের আকৃতিতে ফিরলাম। বেশ আছি। খাচ্ছি, ঘুরছি এদিক-ওদিক। চেনাজানা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত হচ্ছি আমরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পলাতক উদ্বাস্তু হলেও বড়দা কিন্তু ওসব চিন্তা করতে দেয় না। নিয়মিত খেয়েদেয়ে শরীরের ঘাটতি পূরণ করছি। চারদিক থেকে বড়দার নামে অন্যান্য সব ভাইদের কৃপা করুণায় উপাচার আসছে নিয়মিত। আমরা আত্মীয়ের স্বীকৃত অতিথি।

এখানে থেকে কলকাতার সংবাদপত্র, স্থানীয় সংবাদপত্র পড়ে যুদ্ধের বিষয়বৃত্তান্ত দেখি, রেডিও শুনি। বিশেষ করে চরমপত্রের বিশ্লেষণ শুনে শুনে ওষ্ঠাগত প্রাণ পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে গেল যেন। হ্যাঁ, পুরোদমে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চলছে। সাইরেন বাজে, যুদ্ধবিমান ওড়ে। দেখি, হাততালি দিই, ঈশ্বরকে ডাকি- সুদিন যেন অচিরেই ফিরে আসে।

কোন দিক দিয়ে, কীভাবে যে ৯ মাস কেটে গেল, বোধগম্য নয়। দেশ ছেড়েছি ফেব্রুয়ারি মাসে, এখন নবেম্বর। সবার আশ্বাস, দেশ শত্রুমুক্ত হতে বেশি দিন সময় নেবে না; বিদেশের সমর্থন আছে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে। মঙ্গলময় ঈশ্বর যেন তাই করেন।

নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধ্বংসের অবসান ঘটলো এক শুভ দিনে। দেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হলো ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। লাখো শহীদের রক্তের স্রোতে ভাসা স্বদেশ ভূমে স্বাধীন দেশের পতাকা উড়ছে। সতন্ত্র পরিচয় স্বাধীন বাংলাদেশ, জয় বাংলা! সেই সঙ্গে স্বাধীন দেশের এক নতুন নাগরিক এলো আমার সংসারে, স্ত্রী কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে। শত দুঃখ ঘুচে গেল। সবাই নাম রাখতে বলে জয়া। এখন দেশে ফেরার আয়োজন চলছে। শত্রুমুক্ত দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মন উচাটন। একদিন ফিরলাম- যে পথে আগমন সে পথে প্রত্যাগমন। কুমিল্লা দিয়ে নেমে ট্রেনে সোজা চলে এলাম চট্টগ্রাম, গ্রামের বাড়ি। প্রথম দেখা হবে ছেড়ে আসা যৌথ পরিবারের অবশিষ্টজনদের সঙ্গে- জেঠামশাই, জেঠিমা এবং দাদার বউ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

বাড়িতে ঢুকেই সর্বপ্রথম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দর মম জননী জন্মভূমি। আমার বাবা-মা অনেক বছর আগেই বিদেহী। বাড়িতে সবাই সুস্থ আছে। দাদার জগদ্দল চাপা বুক হালকা হলো স্ত্রী-পুত্র, বাবা-মাকে জীবন্ত দেখে। তারাও আমাদের দেখে উলুধ্বনি দিল। এ শব্দের সংকেতেও উচ্চারিত হচ্ছে যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস 'জয় বাংলা'। পাঁচবার।

১৩/ই, অভয় দাস লেন
টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩

'৭১ এর তিন অধ্যায়

মাসুদুল হক চৌধুরী

১৯৭১-এর এপ্রিল-মে, তিন মাস ছিল আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের পশ্চাৎপসরণ এবং প্রস্তুতির সময়। বাংলার প্রকৃতিও যেন এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতের আক্রমণের পর বাঙালি সশস্ত্র যোদ্ধারা একে একে শহর-উপশহর, বন্দর-নগর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে এসে জড়ো হয়েছিল। প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গ্রামের স্কুলশূন্য বাড়ি, হাটবাজার ইত্যাদি সুবিধাজনক স্থানে গড়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। ঐ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন থেকে বিচার-আচার সবকিছুই পরিচালিত হতো সংগ্রাম কমিটি এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ পরিচালনায়। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যুবকদের তালিকাভুক্ত করে যথা সময়ে ট্রেনিং, প্রয়োজনে সীমান্তের অপর পাড়ে পাঠানো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি অমন সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল যা আজ ভাবতে অবাক লাগে। একই মন্ত্রে, একই সাধনায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ জনপদ। হ্যাঁ, বলছি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার ১০ নম্বর আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কথা। সত্যিই '৭১-এর এপ্রিল থেকে '৭২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে স্থানীয় যে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছিল তার মডেলটি যদি আজ সারা দেশে চালু করা যেত তবে বাংলা সত্যিই সোনার বাংলা হতো। কী কী জাদুর পরশে পুরো ইউনিয়নের মানুষগুলো সোনার মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যার যা কিছু ছিল সবাই দেশের জন্য তা দিতে প্রস্তুত ছিল। আমি অনেক মাকে দেখেছি তার হাঁড়ির শেষ চালটুকু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দিয়ে দিতে। নিতে না চাইলে বলতো, আমি গরিব দেখে তোরা ঘৃণা করিস? না হয় নিবি না কেন? না নিয়ে উপায় ছিল না। মানুষের এই মমত্ববোধই সেদিন আমাকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল স্বাধীনতা আসবেই। এ যুদ্ধে আমাদের বিজয় ঠেকাবে এমন সাধ্য কারো নেই।

বলছিলাম আমিশাপাড়ার কথা। পাকিস্তানি সৈন্যরা যার নাম দিয়েছিল 'মুক্তি ফৌজের ক্যান্টনমেন্ট'। সুবেদার লুৎফুর রহমান ও নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ যুদ্ধ করতে করতে এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে পড়েন আমিশাপাড়া অঞ্চলে। এই ইউনিয়নের দক্ষিণ থেকে উত্তর, পূর্বদিক থেকে পশ্চিম সব জায়গায় ঘুরে শেষ অবস্থান নেন মধ্যবিন্দুতে। এদের ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে আসে প্রাণচাঞ্চল্য আর শত্রুর মোকাবেলা করার প্রেরণা। আমিশাপাড়া, আবিরপাড়া, আমিনবাজার, কড়িহাটি, সোনাপুর, প্রত্যেক ফ্রন্টে সংগ্রাম কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিজস্ব সংবাদদাতার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। এলাকার সমাজপতি এবং বিত্তবানগণ সর্বোত্তভাবে সাহায্য করেন। যারা মুসলিম লীগ বলে খ্যাত ছিলেন তারা ছিলেন নিশ্চুপ। প্রকাশ্যে কোনো অসহযোগিতা করতে কাউকে দেখিনি। আমিশাপাড়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন হাজী ওয়াজীউল্লা, নূরনবী চৌধুরী, শেখ নুরুল আমিন (কালা), আবিরপাড়ার সালেহ আহম্মদ ভুঁইয়া, আমিন বাজারের রহমত উল্লাহ, আবদুল হক পাটোয়ারী, লোকমান হোসেন প্রমুখ। এর মধ্যে হাজী ওয়াজীউল্লাহ সাহেব প্রধান বিচারকের দায়িত্বও পালন করতেন। সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং বেসামরিক প্রশাসনিক সমন্বয়ের কারণে পুরো যুদ্ধের সময় এ অঞ্চলটি মুক্ত ছিল। খান সেনাদের কোনো আক্রমণই এর বিপর্যয় ঘটাতে পারেনি। পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় কয়েকবার আক্রমণ করেও এ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রতিবার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়ক থেকে পালোয়ানপুর দিয়ে উত্তর দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের নিয়ে আক্রমণ চালায়। নিরীহ মানুষের ধনসম্পদ লুট, অগ্নিসংযোগ বিশেষ করে হিন্দুদের নিধন ছিল এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। আমানউল্লাহপুর বাজারে অগ্নিসংযোগ, কাছিহাটায় কৃষ্ণসুন্দর ডাক্তারের বাড়ি লুট এবং অগ্নিসংযোগ করে রাজাকার বাহিনী আমিনবাজার আসে। পাক সৈন্যরা কাছিহাটায় অপেক্ষা করতে থাকে রাস্তায়। একটি বাঁশের সাঁকো থাকায় তারা উত্তর দিকে আসতে সাহস পায়নি। আমিন বাজারে কয়েকটি দোকান লুটপাট করে রাজাকাররা চারদিকে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। আমাদের বাড়িটি বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ইতিপূর্বে এখানে মুক্তিবাহিনী অবস্থান করায় আমাদের বাড়িটি ছিল তাদের গুলির

টার্গেট। রাজাকার আর খান সেনাদের আগমনের খবর পেয়ে ইতিমধ্যে বাড়ির লোকজন সবাই পশ্চিম দিকে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। আমি এবং আমার সেজ চাচা বাড়িতে অবস্থান করে সতর্কভাবে সব অবলোকন করছিলাম। কোনো দিক থেকে কোনো প্রতি আক্রমণ নেই দেখে রাজাকার বাহিনী আরো উত্তর দিকে কেশারখিল পর্যন্ত গেল। তারা হয়তো ধারণা করছে, মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্গ বলে খ্যাত আমিশাপাড়া পর্যন্ত যেতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ খুব কাছে থেকে শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেছে, এতে যেন শূন্য গ্রাম জেগে উঠলো। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে রাজাকাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু হটতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যে রাজাকাররা আমিনবাজারের দক্ষিণে এসে অবস্থান নিলো। শুরু হলো সম্মুখযুদ্ধ। আধা কিলোমিটার দূরে কাছিহাটায় অবস্থানকারী খান সেনারাও উত্তর দিকে রকেট আর ভারী মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। তাদের উদ্দেশ্য রাজাকারদের উদ্ধার করা। মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযানে রাজাকাররা পিছু হটতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা আমিনবাজার ঈদগাহর উত্তর দিকে অবস্থান নেয়। সৈন্যরা কয়েকশ মিটার দূরে সেরাংদের সাঁকোর দক্ষিণ পাশে মাঝখানে শ'খানেক রাজাকার। তরুণ বয়সে এ সম্মুখযুদ্ধ দেখবার জন্য একটি নারকেল গাছ আড়াল করে আমাদের বাড়ির পূর্বপাশে অবস্থান নিই। রাজাকাররা কেউ সাঁতার দিয়ে, কেউ সাঁকো দিয়ে খাল পার হয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষার পানিতে ধানক্ষেত আর ডোবা-নালা সব ছিল টইটম্বুর। আমি লক্ষ্য করলাম সাঁকো থেকে কয়েকজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাকিস্তানি সৈন্যরাও ইতিমধ্যে পিছু হটতে আরম্ভ করলো, রাজাকারদের যারা পড়ে গেল তারা পশ্চিম দিকে ধানক্ষেতে আশ্রয় নিল। এর মধ্যে একজনকে আমি দেখলাম পশ্চিম দিকে খালের পাড়ে ধরে আসছে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে এসে এক পর্যায়ে সে আমার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার সেজ চাচা হাবিব উল্লাহ চৌধুরীকে বললাম, এদিকে একজন রাজাকার দেখেছি। চাচা এবং আমি মুহূর্তেই আমাদের ঘাসকাটা নৌকা দিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম। গ্রামের লোকজন সব সামনের রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে গেল। আমরা চাচা-ভাতিজা খালের পাশাপাশি এলাম। বাঁশের লগি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে রাজাকার খুঁজতে লাগলাম হঠাৎ আমার খেয়াল পড়লো পূর্ব দিকে, 'ছনভিটার' দিকে দেখলাম তাল গাছের গোড়ায় লম্বা লম্বা 'ছন' যেন নড়ে উঠলো। চাচাকে বললাম, চলুন ওখানে দেখি। নৌকা নিয়ে ছনভিটায় ভেড়ালাম। আমাদের হাতে দুটি বাঁশের লগি। ছনভিটার মাঝখানে তালগাছটার কাছাকাছি আসতেই দেখি কালো দাড়িওয়ালা এক দিগম্বর রাজাকার। চিৎকার করে বলছে, আমাকে মাফ করুন, আমাকে মারবেন না। আমি চিৎকার করে উঠলাম রাজাকার। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে

আজ এতো বছর পরও চন্দ্রগঞ্জ গেলে আমি খুঁজি সেই কানা রাজাকারকে। তার চেহারা আমি কোনো দিন ভুলবো না। কেউ কী এ জল্লাদের খোঁজ দিতে পারেন? আমার বিশ্বাস, এ খুনি বেঁচে আছে এ স্বাধীন বাংলাদেশে গোলাম আযমদের মতো

আরেকটি নৌকা নিয়ে এলেন আরেক ভদ্রলোক। তিনি লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরে দিলেন কয়েক ঘা। আমি এবং চাচা বাঁশের লগির মৃদু সদ্ব্যবহার করলাম। ইতিমধ্যেই গ্রামের লোকজন এসে জড়ো হলো রাজাকার দেখতে। সংগ্রাম কমিটির আবদুল হক পাটোয়ারী এসে গণপিটুনি থেকে রক্ষা করলেন রাজাকার ওয়াজিউল্লাহকে। তিনি জানালেন মুক্তিযোদ্ধারা আসছেন, এর থেকে হানাদারদের খোঁজ-খবর নেয়া যাবে। সুতরাং একে হত্যা করা যাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা এসে রাজাকারটিকে নিয়ে আমিশাপাড়ার দিকে চলে গেলেন। '৭১-এর ১০ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধৃত রাজাকার নেতা আবু তাহের হাজী ও তার পুত্র হান্নানের কাছে জানা যায়, এ যুদ্ধে অন্তত ২০ জন রাজাকার আহত হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত কয়েকজনক সদর হাসপাতালে পাক সেনারা নিয়েছিল, যাদের খবর আর তারা জানে না। আমিন বাজার যুদ্ধের পর পাকবাহিনী বা রাজাকাররা আর এদিকে আসেনি।

২. অপারেশন চন্দ্রগঞ্জ ব্রিজ

১৯৭১ সালের ৬ মে নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কের ফেনাঘাটায় এক স্মরণীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর এম্বুশ পার্টির অতর্কিত আক্রমণে পাকবাহিনীর আট সৈন্য খতম হয় এবং একই নামের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা (ইসমাইল) শাহাদতবরণ করেন। এরপর থেকে হানাদার সৈন্যরা লক্ষ্মীপুর সড়কে যাতায়াত বৃদ্ধি করে এবং প্রতিদিনই চৌমুহনী-মাইজদী থেকে গিয়ে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের নানা জায়গায় অত্যাচার-অগ্নিসংযোগ এবং গণহত্যা চালাতে থাকে। এর মধ্যে গঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে লতিফপুরে হানাদার বাহিনী তাদের অনুচর এ দেশীয় কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে অনেক বাড়ি ভস্মীভূত করে এবং পাঁচজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

পাক হনাদার বাহিনীর অত্যাচার আর হত্যাযজ্ঞের খবর আমিশাপাড়ায় অবস্থানকারী মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রতিদিনই আসতো। কিন্তু দূরত্বের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এসে কভার দিতে পারতো না। তাই আমিশাপাড়া অঞ্চলের অধিনায়ক সুবেদার রহমান স্থির করলেন চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার। এর প্রথম কাজ চন্দ্রগঞ্জ বড় ব্রিজটি ধ্বংস এবং রাস্তা কেটে আধা মাইল এলাকা যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত করে দেয়া। চন্দ্রগঞ্জ ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য পর্যাপ্ত বিস্ফোরক না থাকায় তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কিছুদিন। মে মাসের শেষের দিকে তিনি আশপাশের সব মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাতের অন্ধকারে চৌমুহনী-চন্দ্রগঞ্জ সড়ক বিচ্ছিন্ন করা হবে। ব্রিজ ধ্বংস করার মতো পর্যাপ্ত বিস্ফোরকও ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছলো। বিভিন্ন গ্রামের সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের জানালেন অন্তত এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক শাবল, কোদাল, গাঁইতিসহ প্রস্তুত থাকতে।

জুন মাসের প্রথম দিকে এক পড়ন্ত বিকালে বন্ধু নূরুল আমিন ও আবুল কালাম এসে জানাল, আজ রাতেই চন্দ্রগঞ্জে অপারেশন হবে। আমাকে সন্ধ্যার পর শাবল, কোদাল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলল। সন্ধ্যায় গ্রামের অন্য সবাইকে নিয়ে তারা আমাদের বৈঠকখানায় আসবে। মাগরিবের নামাজের পর আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে আমাদের কাজের ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোদাল আর শাবল হাতে বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত ৮টার দিকে নূরুল আমিন আমাদের গ্রামের আরো ১০-১২ যুবকসহ এসে হাজির। বলল, সবাইকে বটগ্রাম স্কুল মাঠে জড়ো হতে হবে। আমি মাকে বলে রওনা দিলাম, মা প্রথমত আপত্তি করলেন, পরে দলবল বড় দেখে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলেন। বটগ্রাম স্কুল মাঠে গিয়ে দেখি কয়েকশ' লোক শাবল, কোদাল হাতে জড়ো হয়েছে। কী অমোঘ আকর্ষণে জীবন তুচ্ছ করে 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো' বজ্রকণ্ঠের অমর আহ্বানে একত্রিত হয়েছে দরিদ্র কৃষক, মজুর, ছাত্র, যুবক, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত গ্রাম। রাত ৯টার দিকে নির্দেশ এলো চন্দ্রগঞ্জের দিকে রওনা হবার। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোনো নেতা নেই, নেই কোনো কমান্ডার। তবুও সুশৃঙ্খলভাবে নিঃশব্দ মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। রাতের অন্ধকার যেন সবাইকে নিরাপত্তা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা চারদিক থেকে কয়েক হাজার লোক বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। তারপর বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে শুরু হলো রাস্তা খনন। কন্ট্রাক্টর পুল বরাবর রাস্তা কাটা শুরু করলাম। মাটির অংশ কাটতে তেমন বেগ পেতে হলো না। কিন্তু পিচঢালা অংশে এসে সবাই হাঁপিয়ে উঠলাম। অনভ্যস্ত হাতে শাবল আর কোদাল দিয়ে রাস্তা কাটা সেকি চাট্টিখানি কথা! তবু পালাক্রমে আমরা কাটতে থাকলাম- এভাবে চন্দ্রগঞ্জ থেকে ফেনাঘাটা পর্যন্ত কয়েকটি পয়েন্টে রাস্তা কাটা হলো। দু'দিকের পানির টহল দিয়ে আমাদের কাজ করতে হলো। মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র জোয়ানরা টহল দিয়ে আমাদের মনোবল

অটুট করছিল আর নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাত ৩টার দিকে প্রচন্ড বিস্ফোরণে চন্দ্রগঞ্জ বড় ব্রিজটি ভেঙে পড়লো। তখন আমরা যেন 'অপারেশন সাকসেসফুল' এ রকম বিজয় আনন্দ অনুভব করলাম। এক ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে দেখে এলাম বড় ব্রিজের ভেঙে পড়া স্প্যানটি। অতঃপর যে পথে এলাম সে পথেই দলবেঁধে ভাঙা কোদাল, ভোঁতা শাবল আর ফোসকা পড়া হাত নিয়ে এলাম নিজ নিজ বাড়িতে। আসার সময় চন্দ্রগঞ্জ থেকে উত্তর জনপদের সংযোগ রক্ষাকারী দুটি কাঠের পুল কন্ট্রাক্টর পুল ও পালোয়ানের পুল কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়া হলো, যাতে 'খানের বাচ্চারা' উত্তর দিকে না আসতে পারে। এভাবে কয়েক হাজার লোকের অংশগ্রহণে এক রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কটি সফলভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে পরবর্তী বেশ কয়েক দিন খান সেনাদের অত্যাচার থেকে এ অঞ্চলের জনগণ নিস্তার পেয়েছিল।

এই অন্ধকার রাতের অপারেশনের একটি দৃশ্য আজও অমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। পুলের উত্তরে অভিরামপুর গ্রাম। এ গ্রামের মধ্যে একটি ছোট খালের ওপর একটি নড়বড়ে বাঁশের সেতু ছিল। আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন সেতুর একপাশে মাথায় টুপি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি আর শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত এক বৃদ্ধ হাতে একটি হারিকেন অপর প্রান্তে ১০-১২ বছরের একটি ছেলে আরেকটি হারিকেন দিয়ে অন্ধকারে আমাদেরকে সাঁকো পারাপারে সাহায্য করছিল। ফেরার সময় কিছুটা আলো থাকা সত্ত্বেও দেখলাম দুজনই একইভাবে আছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদু এখন তো ঘরে যেতে পারেন, সারা রাত না ঘুমিয়ে কাদা-জ্বলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন বয়স হয়েছে, নাতিটাও ছোট। তোমাদের মতো রাস্তা কাটতে পারবো না, তাই অন্তত এ কাজটি করে তোমাদের সঙ্গে শরিক হলাম। আর তোমাদের রাস্তায় রেখে ঘরেই বা যাই কী করে। কী এক মমতার বন্ধনে বাঁধা আবেগে আপ্লুত একটি জাতি স্বাধীনতার এতো বছর পর এখনো চোখের সামনে ভাসে ফেরেশতার মতো শুভ্র সেই দেশপ্রেমিক বৃদ্ধের মুখ। যার হারিকেনের মৃদু আলো দেশপ্রেমের আলোকবর্তিকারূপে সেদিন জ্বলে উঠেছিল। আমার দৃষ্টিতে সেই ছোট ছেলে আর তার দাদু দুজনই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

৩. সেই কানা রাজাকার

'রাজাকার' বাঙালি জাতির অভিধানে আজ একটি ঘৃণিত শব্দ। রাজাকার বলতে এখন আমরা যা বুঝি তাহলো বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী, ধর্ষণকারী, অগ্নিসংযোগকারী ও হত্যাকারী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ শব্দটির উৎপত্তি বাংলা ভাষায়। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা দেখলো এ বিশেষ্য বা এর বীভৎস রূপ। সেদিন রাজাকার শব্দটি শুনলে বাংলার মা-বোনেরা আঁতকে উঠতো। সাধারণত মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরকারে পানাহ্ চাইতো। আর মুক্তিযোদ্ধারা এদের প্রতিহত করতে ছিল সদা উদগ্রীব। সেদিন যদি দেশ মাতৃকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী জাতির কলঙ্ক এ সমস্ত নরঘাতকরা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজাকার-আলবদর-আল-শামস নামক পশুবাহিনী গঠন না করতো, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জাতির ক্ষতি হতো আরো অনেক কম। ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ আর দু'লক্ষ মা-বোনকে ইজ্জত হারাতে হতো না। সম্পদের ক্ষতি হতো অনেক কম। জাতির বিবেক বুদ্ধিজীবী শিক্ষকদের অকালে প্রাণ দিতে হতো না ঘাতকদের হাতে। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধের সময় এ রাজাকাররা এ দেশে সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের গোড়াপত্তন করে, যার কুফল আজ স্বাভাবিক অবস্থায়ও জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্থিরচিত্র দেখলে একটি ছবি আমার মনে দাগ কাটে, সেটি হলো একটি রিকশার ওপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে দুটি মৃতদেহ- দুইজন শহীদের পবিত্র লাশ। নির্মম হত্যাকান্ডের একটি স্মারক দৃশ্য। '৭১-এর অক্টোবর ছিল রমজান মাস। পবিত্র মাস সিয়াম সাধনা আর মুক্তিযুদ্ধ পুরোদমে চলছিল সারা বাংলায়। এ পবিত্র সিয়ামের মাসে রাজাকারদের অত্যাচার-নির্যাতন-হত্যা একটুও থেমে থাকেনি। মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী সন্দেহে তারা হত্যা করেছে হাজার হাজার মানুষ। এ রকম একটি হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে আমাকে '৭১-এর ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার নোয়াখালী চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে। দিনটি ছিল চন্দ্রগঞ্জের হাটবার। আমাদের বাড়ি আমিশাপাড়া ইউনিয়নে। আমিশাপাড়া ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি। সে কারণে অন্য এলাকা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেখানে যেত না। পাক হানাদার এবং রাজাকাররা চারদিক থেকে প্রতিবন্ধকতা দিয়ে রাখতো এ এলাকাকে। রমজান মাসের কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সওদা করতে গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ মুরুব্বীর সঙ্গে সেদিন এসেছিলাম চন্দ্রগঞ্জ বাজারে নৌকা করে। আমাদের নৌকা বাজারে পৌঁছালো দুপুর ২টার দিকে। ঘাটে ভিড়তেই দেখি সবাই আতঙ্কিত। খবর নিয়ে জানলাম, প্রতাপগঞ্জ স্কুলে অবস্থানকারী রাজাকাররা কিছুক্ষণ পরপর এসে সন্দেহজনক লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো লোক প্রতিউত্তর করলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে থাকে। আমাদের নৌকায় আমরা দুজন তরুণ (আমার বয়স তখন ১৫ বছর) আর তিনজন বয়স্ক। তদুপরি আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছে। ভাবলাম, এবার আর রক্ষা নেই। রাজাকারদের কাছে নিশ্চয় আমাদের এলাকার খবর আছে। সুতরাং আমাদের ধরতে পারলে জীবিত ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। বাজার-সওদার ভাড় নিলেন সাথের একজন। আমি গিয়ে বসলাম পরিচিত এক রাইস মিলের গদিতে যেন সেখানে কাজ করি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একদল রাজাকার দ্রুত পূর্বদিকে কাঠের পুলের দিকে যাচ্ছে। আধঘণ্টা পর আবার রাজাকার দল ফিরে এলো দুজন রক্তাক্ত মানুষকে টেনে-হিঁচড়ে সঙ্গে করে, সারা শরীর রক্তাক্ত। গ্রাম্য সরল মানুষ বারবার বলছে, আল্লাহর দোহাই আমরা কোনো অপরাধ করিনি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বেয়নেটের খোঁচায় অবিরাম রক্ত ঝরছে। আর একজন রাজাকার (সম্ভবত কমান্ডার) রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করছে। কখনো বুট দিয়ে লাথি মারছে, শত শত মানুষ শুধু তাকিয়ে আছে। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কিংবা কী তাদের অপরাধ শুধু এটুকু জিজ্ঞেস করারও সাহস পাচ্ছে না। আমিও কাপুরুষের মতো দেখছি এ অত্যাচার আর রক্ত ঝরার দৃশ্য। আমি যেখানে বসে ছিলাম তার কাছাকাছি এসেই ওরা পেলো একটি রিকশা। দুজন মৃতপ্রায় যুবককে ওরা টেনে-হিঁচড়ে রিকশায় উঠাতে চাইলো। একজন প্রায় নিষ্প্রাণ, চলার মতো শক্তিও তার ছিল না। অন্যজন আকুতি করে ওদের পায়ে পড়লো ছেড়ে দেয়ার জন্য। বিরক্ত হয়ে নেতা গোছের রাজাকার বয়স বিশ-একুশ হবে এক চোখ কানা, হালকা লাল দাঁড়ি, বেয়নেট দিয়ে প্রকাশ্য জনতার মাঝে কয়েক খোঁচা মারলো। বাবাগো-মাগো-আল্লাগো বলে চিৎকার করে লোকটি নিস্তেজ হয়ে গেল। চারজন রাজাকার টেনে দুজনকেই রিকশায় উঠালো। রিকশাওয়ালাকে বললো- শালাদের ক্যাম্পে নিয়ে চল, মুক্তিদের পার করার মজা বুঝুক। আমি চেয়ে রইলাম সেই কানা রাজাকারের দিকে। ঘৃণায় আর ক্রোধে শরীর জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু করার কিছুই নেই। এ অবস্থা দেখে বাজার-সওদা বাদ দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ঘাটে এলাম। এসে শুনলাম ওরা দুজন নৌকার মাঝি। রাজাকাররা সন্দেহ করেছে তারা নৌকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আনা-নেয়া করছে। আমাদের নৌকার মাঝি বিলম্ব না করে উত্তর দিকে নৌকা ছাড়লো।

৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা চন্দ্রগঞ্জ মুক্ত করলো। ৭ ডিসেম্বর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে করে সকাল থেকে সারা দিন আমি খুঁজছি সেই হিংস্র কানা রাজাকারকে। তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছি চন্দ্রগঞ্জ স্কুলে অবস্থানরত আমার পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের ভাইকে (মানিকনগর), কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যেতে সফল হয়েছে এ নরঘাতক। বিজয়ের পর পত্রিকার পাতায় রিকশায় মৃত বাঙালি লাশের ছবিটি দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। মনে হলো এ দৃশ্যটিই আমি দেখেছিলাম '৭১-এর ২১ অক্টোবর বিকালে নোয়াখালীর চন্দ্রগঞ্জ বাজারে! শুধু নেই হত্যাকারী কানা রাজাকার ও তার দল।

আজ এতো বছর পরও চন্দ্রগঞ্জ গেলে আমি খুঁজি সেই কানা রাজাকারকে। তার চেহারা আমি কোনো দিন ভুলবো না। কেউ কী এ জল্লাদের খোঁজ দিতে পারেন? আমার বিশ্বাস, এ খুনি বেঁচে আছে এ স্বাধীন বাংলাদেশে গোলাম আযমদের মতো।

লেখাটিতে ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি

রামকৃষ্ণ মিশন ও রাজাকার কাহিনী

আনিসুল হক

আমি ছিলাম লিকলিকে, হার্টের রোগী। ঢাকায় থাকা-খাওয়া ও পড়ার খরচ যোগানোর জন্যে টিউশনির সঙ্গে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে বিবিসি মনিটরিং-এর পার্টটাইম কাজ করতাম। এ অবস্থায় রিজিগের ওপর হাত দিয়ে ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত সকল মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করার উন্মত্ত নেশা ছিল। রেডিও সংবাদ এবং পত্রিকা হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। সব সময় হাতে থাকতো একটা সুন্দর ছড়ি, কেন তা আমি নিজেও জানতাম না। খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে লম্বা চুল এই ছিলাম আমি। কয়েকজন এমএনএ এবং মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান ও মেম্বার কেন আমার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিল তাও জানি না।

২৫ মার্চের কালো রাতে গর্জে ওঠার বাসনা জাগে কিন্তু দুলাভাই-বোন অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমাকে শান্ত হতে বলে। অবশেষে খাঁচায় বন্দী সিংহের মত মেসে ও মতিঝিল কলোনিতে থাকতে বাধ্য হই।

রেডিওতে জিয়ার কণ্ঠের ঘোষণায় আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। বারান্দায় মাথা নিচু করে বসে ঘোষণা শুনছিলাম, ঠিক ঐ সময় একটি কালো ছেলে এসে আমার পাশে বসে পড়ে। তাকে চিনি না, কখনো দেখিনি। সে পরিচয় দিয়ে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগে এমএ পড়ে, যুদ্ধ করবে। এক ফাঁকে চলে যায়।

পরদিন দুপুরে আমি বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়ে আছি। কমলাপুর রেল স্টেশনে বৃষ্টির মত গুলি চলছে। দেখি ছেলেটি একটি বন্দুক হাতে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর রক্তাক্ত অবস্থায় সে ছুটে পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। পড়ে যায় তো আবার উঠে দৌড়ানোর চেষ্টা করে। এভাবে একটি ভবনের আড়াল হয়ে গেলে সে আমার হৃদয়ে এক রক্তাক্ত ইতিহাস হয়ে থাকে। নিজের অক্ষমতা ও অসুস্থতাকে দোষ দিতে থাকি।

আমি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। বোন বুঝতে পেরে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং ফুফাতো ভাই ঢাকার এডিসি জেনারেল সিএসপি ফয়েজ উল্লাহকে বর্তমানে (অবঃসচিব) জানান। ফয়েজ উল্লাহ সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, 'তুমি যেহেতু অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম তাই ওখানে গিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না। বরং তার চাইতে দেশে থেকে কিছু কাজ কর। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ এবং তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণের পদক্ষেপ নাও, কাজে লাগবে। আর রামকৃষ্ণ মিশনের (ঢাকা) দায়িত্ব দিচ্ছি, তুমি ওটাকে রক্ষার ব্যবস্থা করা।' তাঁর পরামর্শ আমার পছন্দ হয়।

আমি রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং প্রশাসক নিযুক্ত হই। ফয়েজ উল্লাহ সাহেব মাঝে মাঝে এসে সবকিছু তন্ন তন্ন করে দেখতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি গোপন ছিল।

আমি যোগদানের আগে মিশন পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এডিসি জেনারেল- সভাপতি, মুসলিম লীগের আবদুল মতিন, সহসভাপতি- ঐ দলের অ্যাডভোকেট মাহতাব উদ্দিন-সদস্য সচিব এবং জীবন বীমার পরিচালক জামান- কোষাধ্যক্ষ। ঐ সময়েই ৫ জন শিক্ষক, ১ জন হিসাব রক্ষক ও ১ জন পিয়ন নিয়োগ দেয়া হয়। এরা সকলেই মুসলিম, তন্মধ্যে একজন মৌলানা। শিক্ষকদের একজন অ্যাডভোকেট মাহতাব উদ্দিনের আত্মীয় ফরিদ আহমদ ছিল সৈনিক, যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছে। তবে সে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল এবং যতসব গোপন সংবাদ আমাকে দিত। মৌলানা ও অপর দুই শিক্ষক এবং হিসাবরক্ষক ছিল রাজাকার। এরা বিভিন্নভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ আমাকে হয়রানির চেষ্টা চালাতো।

প্রথম দিন রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে দেখি সব লন্ড-ভন্ড ভাঙাচোরা অবস্থা এবং জিনিসপত্র লুট হয়ে গেছে। মৌলানাকে দেখি একটি ঘরের সামনে আজান দিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়তে। আমি পিয়নের কাছে জানতে চাই যে ওখানে আগে থেকে মসজিদ ছিলো কিনা? পিয়ন জানায় মতিন, মাহতাব ও জামানেরা একটি ঘরকে মসজিদ বানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা কেন্দ্রটির সবকিছুই নিয়ে গেছে। পাড়ার এক বাসায় গেলে হোমিও চিকিৎসার ওষুধপত্র ও মূল্যবান বেশ কয়েকটি বই দেখে নিশ্চিত হই- এগুলো রামকৃষ্ণ মিশনের। তারপরও কৌতূহলবশত বাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করলে স্বাভাবিকভাবেই বলে ওখান থেকে (রামকৃষ্ণ মিশন) নিয়ে এসেছি। যেন তার বাপের বাড়ির সম্পত্তিতে সে ভাগ বসিয়েছে।

লাইব্রেরির মূল্যবান বই, পত্র-পত্রিকাও লুট হয়ে গেছে। আমি দেখি অবশিষ্ট বইগুলো নিচে পড়ে আছে, বৃষ্টির পানি ঢোকায় কিছু বই একেবারে ভিজে গেছে। অধিকাংশ উঁইপোকায় ধরেছে। ক্যাটালগে দেখি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের উপর বহু দুর্লভ বই ও পত্র-পত্রিকা ছিল কিন্তু এখন কিছুই নেই। আমি নিজ হাতে বই ও পত্র-পত্রিকাগুলো তিন দিন রোদে দিয়ে শুকাই, উঁইপোকা তাড়াই, পরে শেলফে সাজিয়ে রাখি। এখান থেকে লুট হওয়া কয়েকটি মূল্যবান বই ঐ চোরের ঘরে দেখেছি।

মালখানায় প্রচুর লেপ- তোষক, মশারি ও বালিশ ছিল। একদিন স্থানীয় কমিশনার মুরাদ ট্রাক ভর্তি করে এগুলো অন্যান্য মালামালসহ লুট করার সময় এক লোক এসে আমাকে খবর দিলে রিকশা যোগে ছুটে যাই। আমি বাধা দিলে কমিশনার হাতে থাকা ডেগার নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসে, বলে এ নিয়ে কোনো কথা বললে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দেবে।

মিশনে ঢুকতে বাঁ দিকে দু'টি বিশাল গাছ (যমজের মত) মাহতাব ও জামান কেটে নিয়ে যায়। আমি বাধা দিলে তারা বাঘের মতো গর্জে ওঠে এবং গালাগাল দেয়। তৃতীয় গাছ কাটার সময় বাধা দিলে মুরাদ কমিশনার কয়েকটি পাড়া ছেলে নিয়ে এসে ভয় দেখায়।

ওখানে ২৫/৩০ বছর বয়সী এক পাগল ছিল। একদিন কমিশনারের নেতৃত্বে কয়েকজন পাড়া ছেলে তাকে ভারতীয় গোয়েন্দা বলে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে নিয়ে যায়, তারপর আর কোনো হদিস পাওয়া যায় না। লোকটা গোয়েন্দা না, পাগল বললে পাড়াদের গালি শুনতে হয়। এক অশীতিপর কুঁজো পূজারী গর্তের মত একটি কুঠুরিতে থাকতো। তাকে ভারতীয় গুপ্তচর বলে ঐ পাড়ারা কয়েকবার হেনস্থা করে। বিশেষ উদ্যোগে তাঁকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ষান্মাসিক পরীক্ষায় সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করার জন্য 'বাঙালিরা সাহসী জাতি' বাক্যটি দিই। স্কুলের রাজাকার শিক্ষকরা এই প্রশ্নপত্রখানা আবদুল মতিন, মাহতাব উদ্দিন ও জামানকে দিয়ে বলে প্রধান শিক্ষক মুক্তিবাহিনীর লোক, সে জন্য এ রকম প্রশ্ন করেছে। তারা প্রশ্নপত্র খানা আর্মি ক্যাম্পে পাঠিয়ে একই অভিযোগ তোলে। ফরিদ এটা শুনতে পেরে প্রতিবাদ করলেও কেউ পাত্তা না দিয়ে শায়েস্তা করার কথা বলে। ফরিদ ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে বলে যে কোনো সময় আর্মি হামলা চালাতে পারে, আমি যেন পালিয়ে থাকি, মিশনে আর না যাই। কিন্তু বিষয়টিকে আমি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারিনি বলে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়মিত মিশনে যেতে থাকি। একদিন বেলা একটার দিকে এক মেজরের নেতৃত্বে তিনজন সেনাকর্মকর্তা মিশনের ভেতর প্রবেশ করলে ফরিদ ছুটে এসে আমাকে পালাতে বলে। আমি না পালিয়ে বরং তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিই এবং পড়ালেখা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কথা বলি। তারা কোনো কথা না বলে চলে যায়।

রামকৃষ্ণ মিশনের ঠিকানা ব্যবহার করে আর্মি জেনারেল টিক্কা খানকে ইংরেজিতে একখানা জরুরি চিঠি লিখি। যার বাংলা দাঁড়ায়

'সরকার এবং সেনাবাহিনীর ধারণা ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট সঠিক নয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হতে বেশি দিন লাগবে না। আমি সরকার ও সেনাবাহিনীকে সঠিক তথ্য দিতে এবং সমঝোতায় পৌঁছার জন্যে সাহায্য করতে আগ্রহী। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত এড়ানো জরুরি দরকার।' অবশ্য এর কোনো উত্তর পাইনি। প্রতিক্রিয়াও জানতে পারিনি।

আবদুল মতিন, মাহতাব উদ্দিন ও জামানরা একবার ঘটা করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। সেখানে শবনম মুশতারী ও মাহতাব উদ্দিনের মেয়ে (বর্তমানে টিভি নাটকের সঙ্গে জড়িত, নাম মনে নেই) হামদ এবং নাত পেশ করে। এ মিলাদ অনুষ্ঠান কি উপলক্ষে করা হয়েছিল তা জানতাম না।

একদিন ফরিদ জানায় আবদুল মতিনের বাসায় স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর দু ছাত্রকে ধরে এনে হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তাদের অপরাধ তারা নাকি মুক্তিবাহিনীর সদস্য। এ নিয়ে পাড়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খবর নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে ছুটে যাই আবদুল মতিনের বাসায়। কিন্তু সেখানে নিয়ে দেখি রাজাকারদের বিরাট জটলা। এ অবস্থায় কোনো কিছু জানতে হওয়ার বা বলার সাহস হারিয়ে ফেলি।

মিশনের ভেতর একটা পুকুর ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় পানিই সমস্যা দেখা দিত বলে দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এসে কলস, বালতি ও পাতিলে করে পানি নিয়ে যেত।

জামানের বাসায় প্রায় প্রতিদিন পাক সেনাদের আসর বসতো। তার দু'মেয়ের সঙ্গে পাক আর্মিদের দহরম-মহরম ভাব ছিল। ফলে তারা প্রায় সময় আর্মিদের সঙ্গে কাটাতো, কখনো কখনো গভীর রাতে ফিরত। ফরিদ এ সব ঘটনা আমাকে জানাতো। সে মাহতাব উদ্দিনের বাসায় থাকতো বলে তার দেখা ও জানার সুযোগ ছিল। আর তিন জনের বাসাও ছিল পাশাপাশি ।

বেশ কিছু দিন থেকে আবদুল মতিন, মাহতাব উদ্দিন ও জামান উধাও হয়ে যায়। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাচ্ছিলো না, কারণ বেতন দিতো জামান। পরে ফরিদের মাধ্যমে রহস্য উদঘাটিত হয়। সে জানায় তারা অসুস্থতার ভান করে ঢাকা মেডিকেলে আশ্রয় নিয়েছে। বিষয়টি আমার ভেতর কৌতূহল জাগায় বলে হাসপাতালে গিয়ে দেখি মাহতাব উদ্দিনের মাথা, হাত, পা, পেট ইত্যাদি বলতে প্রায় পুরো শরীর প্লাস্টার করা। আমি যখন সমস্যার কথা জানতে চাই তখন সে বলে মুক্তিবাহিনী সহসা ভেতরে ঢুকে পড়বে, তাদের থেকে বাঁচার জন্য এ পথ বেছে নেয়া। এটি মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ঘটনা।

১১ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর পক্ষে বিমান বাহিনী গভর্নর ভবনের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। হঠাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা শেল আরামবাগের একটি টিনের ঘরে ওপর পড়লে ঘরটি গুঁড়িয়ে যায়। এ ঘরে উত্তরা ব্যাংকের অফিসার একরামুল হক (বর্তমানে এক্সিম ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক) এবং দীপক কুমার গোস্বামী , তার বোন বাসন্তী রানী গোস্বামী, ভাই বৈদ্যনাথ গোস্বামী, ফুফু আন্না রানী গোস্বামী থাকতো। শেলের আঘাতে দীপক কুমার গোস্বামী ও তারা বোনের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, ফুফু মারাত্মকভাবে আহত হয়। একরামুল হক কোনোভাবে বেঁচে যায়। সে আমাকে খবর দিলে তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে যেতে মতিঝিল কলোনি ও আরামবাগের মধ্যবর্তী রাস্তায় রাজাকার ঘোষিত কারফিউর মধ্যে পড়ি। আমি যখন রাস্তা পার হতে থাকি তখন রাজাকারেরা বন্দুক হাতে তেড়ে আসে এবং গুলি করার উদ্দেশ্যে তাক করে ধরে। জানি না কোন সাহসে আমি চিৎকারের সঙ্গে গালি দিয়ে বলে উঠি 'শালার বেটারা সাহস থাকলে গুলি কর'।

আমি ও একরাম আন্না রানী গোস্বামীকে ধরে একবাড়ির বারান্দায় রেখে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে যোগাযোগ করতে থাকি। কিন্তু সে বাড়ির এক ছেলে (বর্তমানে টিভি নাটকের সঙ্গে জড়িত) জানালা দিয়ে বার বার চিৎকার করে ধমক দিচ্ছে মেয়েটিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে।

দীপক গোস্বামী ও বাসন্তী রানী গোস্বামীকে ঐ ঘরে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয় আর আন্না রানীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি এবং একরাম পালাক্রমে তার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলাম। এর মধ্যে পটকা মাছের মতো ভোটকা করে নয়াপল্টন এলাকার এক ছেলে (বর্তমানে মালিবাগে এক পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার) যে নিজেকে ছাত্রলীগের সভাপতি বলে দাবি করতো, সে কিছু বখাটে সঙ্গী নিয়ে মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে ও নিয়ে আসতে চায়। একদিন আমি আর একরাম গেলে ডাক্তার ও নার্সেরা বলে মেয়েটিকে নিয়ে আসতে। কারণ হিসেবে বলে মেয়েটি ওদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকবার জানালা হতে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। আজ ঐ পান্ডার দল ওকে জোর করে নিয়ে যাবে। এর মধ্যে ওরা এসে যায়। আমি মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদারকে একখানা চিরকূট লিখে সাহায্য চাই। একরাম ওটা নিয়ে যায়, পুলিশ এলে আমরা মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসি এবং পরে নবাবপুর রোডস্থ ঢাকা হোটেলের মালিকের ছেলের দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হয়। কারণ এদের সকলের বাড়ি ফরিদপুর জেলার ইশান গোপালপুরে। এছাড়া ঐ হোটেল মালিক যাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিহারীরা মেরে ফেলেছে, তিনি দীপক গোস্বামী পরিবারের অভিভাবকের মত ছিলেন।

আমি রামকৃষ্ণ মিশন ঘটনার চুম্বক ধারণা দিয়েছিলাম মুক্তধারার পরিচালক জওহারলাল সাহাকে, তবে তাকে এটি প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি বলে নিজেকে অপরাধী ভাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারও ভাবতাম। যে কারণে এটি প্রকাশের সাহস কখনো করিনি।

১৫-৩ দোতলা
আরামবাগ,
৭নং সেকশন, মিরপুর, ঢাকা

রাজাকারদের নির্যাতন চিত্র

মনোজিত সেন

২৯ আগস্ট, ১৯৭১। সকাল ১০টা। হঠাৎ গুলির শব্দে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। মা এসময় সবার জন্য সকালের টিফিন পরিবেশন করছেন। তখন আমরা ভয়ে ছোটাছুটি করতে শুরু করলাম। বড় ভাই বোনরা সবাই বাড়ি থেকে দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্য আমাকে তাগিদ করছে। আমার বয়স সবেমাত্র সাত বছর। প্রথম শ্রেণী থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। গুলির শব্দ শুনে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম আশপাশে রাজাকার হামলা চালিয়েছে, হয়ত আমাদের বাড়ির দিকেও আসতে পারে, এ চিন্তা করে আমার বড় তিন ভাই, ২ বোন ও আমি বাড়ি থেকে দ্রুত পালিয়ে ১ মাইল দূরে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমাদের সঙ্গে বাড়ির আশপাশের কিছু লোকজন ছিলো। সবাই মিলে ২০ জন হবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমার মেজ বোন হাতে করে এক টিন খই নিয়েছিলো। সেটা খেয়ে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাই। সন্ধ্যার পর অতিকষ্টে পানিতে জামা কাপড় ভিজিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বাড়ির তিনটি ঘরই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ২টি থাকার ঘর একটি রান্না ঘর। তখন পর্যন্ত ঘরের ভিটাগুলোতে আগুন জ্বলছে। শুধু কয়েক জোড়া পালিত কবুতর এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে তাদের বাসা খুঁজছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময় আমার মা-বাবা ও

জেঠামশাইকে ফেলে চলে যেতে হয়। উনারা ছিলেন সহজ সরল ও পরোপকারী। রাজাকাররা যে ভয়াবহ অত্যাচারী এটা উনারা বিশ্বাস করেননি। উনাদের বিশ্বাস ছিলো আমরা অন্যায় করিনি, কেউ আমাদের ক্ষতি করবে না। অনেক অনুনয় বিনয় করে আমরা ওনাদেরকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারলাম না। রাজাকারদের বাড়িতে আগমন দেখে উনারা দ্রুত বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময় পাশের এক বাড়ি থেকে বাবা ও জেঠাকে রাজাকাররা ধরে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসে। উনাদের সামনেই বাড়ির ঘরগুলোতে আগুন লাগায়।আমাদের আশ্রয়ের জন্য একটা ঘর অন্তত রেখে দিতে। ওরা কোনো কর্ণপাত না করেই একে একে সবগুলো ঘর পুড়িয়ে ফেলে। রাত্রিতে বাড়ি পৌঁছে আমরা বাবা জেঠার কাছ থেকে তা জানতে পারি। বাড়ির পেছন দিয়ে ঢুকে আমরা বাড়ির সমানে গিয়ে দেখি বাবা ও জেঠার রক্তাক্ত পুরো দেহ।

দুজনকে রাজাকাররা বেদম প্রহার করে পুরো শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। দু'জনই একটু সুস্থ হবার পর জানতে পারলাম যে, রাজাকাররা দু'জন বন্দুক দিয়ে বেদম প্রহার করে তাদেরকে স্থানীয় রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। তারাও নিরীহের মতো রাজাকারদের সঙ্গে ক্যাম্পে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপের কারণে উনাদের দু'জনকে রাজাকার নিয়ে যেতে পারেনি। রাজাকারদের সঙ্গে উনারা ক্যাম্পে গেলে আমরা উনাদেরকে জীবিত অবস্থায় হয়ত ফিরে পেতাম না। এরপর মায়ের করুণ অবস্থার কথা জানতে পারলাম। রাজাকারদের আমাদের বাড়িতে আসতে দেখে মা দ্রুত বাড়ির পেছনে এক বাড়িতে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাবার সময় একজন রাজাকার বন্দুক নিয়ে মা'র পেছনে ধাবিত হয়।

অল্পের জন্য তিনিও বেঁচে যান। ঐদিন রাত্রিতে বাড়ি ফিরে মায়ের মুখ থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তা শুনতে পেলাম। এরপর ঐদিন আমরা আমাদের বাড়ির সামনের পুকুর পাড়ে ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। পরনের জামা কাপড় ছাড়া আর কোনো জামা কাপড় তখন আমাদের কাছে ছিলো না। অতিকষ্টে বাজার থেকে কিছু জামা কাপড় কিনে কোনোরকম স্বাধীনতার বিজয় দিবস পর্যন্ত কয়েক মাস কাটাতে হয়।

পরিবারে মা বাবা, দু'বোন, পাঁচভাইয়ের মধ্যে সেজদাদা ছিলেন একমাত্র চাকুরে। তিনি একটি বেসরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বাবা ছিলেন সে সময়ের অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি পোস্ট মাস্টার। নিজেদের জমির ধান বিক্রি করে তখন আমাদের সংসার চলত। আমরা অন্যান্য ভাই বোনেরা সবাই ছিলাম প্রাইমারী, হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র। এছাড়া বাড়ির পুকুর ও বাগান থেকেও আয় হত। যুদ্ধ চলাকালীন আমাদের দু'বর্গাচাষী চৌধুরী পাটোয়ারী ও মহসিন ভূইয়া এ দুজন চাল সরবরাহ করতেন। মা বাবার কাছ থেকে জানতে পারলাম, যুদ্ধের প্রথমেই আমাদের কিছু ধান দুজন বর্গাদারের বাড়িতে রাখা হয়। সে সুবাদে উনারা চাল সরবরাহ করতেন।

সে সময় আমাদের বাড়ি পাহারা দিতেন আমাদের ছোটবেলার বাড়ির কেয়ারটেকার সুজা মিয়া। বর্তমানে তিনি জীবিত নেই। যুদ্ধের ৯ মাস তিনি আমাদের সুখ দুঃখের একজন অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। বিজয় দিবসের পর আমরা সবাই ঠাকুর বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে যাই। কোনো রকম টিনের চালা ঘর তৈরি করে পুনরায় বসবাস শুরু করি। কয়েক মাস আমাদের সবাইকে মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বিছানা করে ঘুমাতে হয়েছে। বাবা-মায়ের ঘুমাতে ভীষণ কষ্ট হত। কারণ উনারা জীবনে ইতিপূর্বে কখনো এভাবে ঘুমায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস তখন চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করতে হয়েছে। হঠাৎ কোনো শব্দ শুনলেই সবাই দৌড়াদৌড়ি করে পালাবার চেষ্টা করত। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস কেউ স্বস্তিতে বাস করতে পারেনি। আমাদের গ্রামে শুধু আমাদের বাড়িই পোড়ানো হয়েছে। আর অন্যকোন বাড়ি পোড়ানো হয়নি। কি অপরাধ করেছি। বাবার কাছে শুনেছি, দেখেছি। আমাদের বাবা দাদা ও পূর্বপূরুষেরা এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকার করতে পারলে আনন্দিত ও গর্বিত হতেন। পাড়া প্রতিবেশীর বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেদের পুকুরের মাছ বিতরণ করতেন। দরিদ্র মানুষের ঘর মেরামতের জন্য বাঁশ ও গাছ বিতরণ করতেন। এছাড়া এলাকার সালিস ও বিচার কার্য তারা পরিচালনা করতেন। এলাকার জনসাধারণের কাছে বাবা, দাদা ও পূর্ব পুরুষদের সুনাম এখনো রয়েছে।

এরপরেও আমাদের ওপর কেন এ নির্মম অত্যাচার, অবিচার করা হলো। গ্রামের নাম কল্যাণপুর, বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার ১৮ নম্বর কুশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত কল্যাণপুর চৌধুরী বাড়ি (মেজকর্তার বাড়ি) নামেই পরিচিতি। পোঃ রূপাচরী। বাবা মা কেউ জীবিত নেই। ভাইবোনরা সবাই জীবিত আছেন।

লেখাটিতে ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি

বিভীষিকাময় দিনগুলো

মাহবুবুল হক চৌধুরী

১৯৭১ সাল। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে আমি সাবেক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের নিলফামারী মহকুমার শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। দেশে তখনও মুক্তিযুদ্ধ শুরু না হলেও দেশবাসী উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পরও সরকার গঠনের জন্য ডাকা হচ্ছে না- পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়াত জুলফিকার আলী ভুট্টো নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল বানচালের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল- এসব ফন্দি-ফিকিরের পেছনে সামরিক জান্তার হাত ছিল। সব আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর ২৬ মার্চের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর বাঙালিরা রুখে দাঁড়ালো শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় নিলফামারী শহরে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। তখনও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোকেরা শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে রাস্তার দুই পাশের সব বাড়িঘর জ্বালিয়ে সামরিক বাহিনীর লোকেরা প্রবেশ করে নিলফামারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলো। আমরা যারা নিলফামারী শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তারা প্রশাসনের নির্দেশে যার যার অফিস খুলে কাজ শুরু করার আয়োজন করলাম। ন্যাশনাল ব্যাংক, সরকারি ব্যাংক ও ট্রেজারির কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য সামরিক কর্মকর্তাদের খুব বড় নজরদায়ি ছিল এই ব্যাংকের ওপর। দেশে সামরিক আইন জারির সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত এমএনএদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং তাদের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করে দেওয়া হলো। এসব জব্দ হিসাবের তালিকা যথাযথভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে কি না সেগুলো তদারকি করতে। সামরিক ও স্থানীয় প্রশাসন, আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে টাকা নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থনীতিতে এসব টাকা যাতে প্রভাব ফেলতে না পারে এবং মুক্তিযোদ্ধারা যাতে করে এসব টাকা ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য তখনকার সরকার এসব টাকা অচল ঘোষণা করলো। লুটপাটের অনেক টাকা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর

লোকদের হাতে ছিল তাই আর প্রথমে এই টাকা বদলোর জন্য ব্যাংকের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও পরে তাদের নিজ ব্যবস্থায় এই টাকা বদল করে নেয়। আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য আদান-প্রদান হতো। ব্যংকের ধান/ চাল বিক্রির বিল কিংবা পাট বিক্রির বিল থেকে টাকা তুলে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতাম।

পাকিস্তানি আর্মিরা ব্যাংকে এসে বিভিন্ন হিসাবের খোঁজ নিতো যেসব হিসাব বড় অঙ্কের টাকা জমা দেখতো যেসব হিসাবধারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালিয়ে বড় অঙ্কের চেক কেটে নিত। এই বিষয়টি আমি স্থানীয় মহকুমা প্রশাসককে জানালে আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার ব্যাংকের সব ব্যবস্থাপককে ব্যাংকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমরা ভবিষ্যতে এমন কাজ করবো না বলে অঙ্গীকার করার পরেই ছাড়া পাই। একদিন এক সুবেদার মেজর জিপ থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে আমার বুকের ওপর রাইফেলের নল ঠেকিয়ে বললো, তোমার ব্যাংকের সাইনবোর্ড ইংরেজিতে কেন লেখা। আমি শহর ঘুরে ব্যাংকের শাখা খুঁজে পাই না। কেন উর্দু সাইনবোর্ড লাগানো হয়নি। আমি বললাম এই সাইনবোর্ড ঢাকা অফিস থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। সুবেদার মেজর বললেন, এখনই এই সাইনবোর্ড বদল করে উর্দুতে লিখতে হবে। আমি পরিবর্তনের আশ্বাস দিলে সুবদার মেজর ডাকবাংলোতে ফিরে যান।

মহকুমা প্রশাসক এসডিও সাহেবের অফিসের পাশেই ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখা ছিল। এটি মহকুমা প্রশাসনের একটি বরাদ্দকৃত জায়গা ছিল। এই ব্যাংকের পাশে। অনেক মালামাল থাকতো। একদিন এক মেজর সাহেব এসে আমাকে জোর করে চেম্বার থেকে বের করে বড় বড় ড্রাম দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলোর ভেতর কি রেখেছো, আমি বললাম, এগুলো ব্যাংকের কিছু নয়। তবু মেজর সাহেব খুশি হতে না পারলে এসডিও অফিসের লোক এসে মেজর সাহেবকে আশ্বস্ত করেন। সৈয়দপুর বিহারিদের খুব বড় ঘাঁটি ছিল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের সময় দেশের অন্যান্যস্থানের বিহারিরা সৈয়দপুরে জমা হয়ে বড় দুর্গ গড়ে তুলেছিলো। পাকিস্তানিরা বিহারিদের পরামর্শ শুনতো। সৈয়দপুর ছিল নিলফামারী মহকুমার বড় শহর। দূরত্ব ছিল মাত্র ১১ মাইল। সৈয়দপুরে বিহারিরা পাক আর্মিদের কুপরামর্শ দিয়ে নিলফামারীর অনেক যুবককে হত্যা করে। অনেক সময় বিহারিরা নিজেও অনেক বাঙালি যুবককে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা করেছে।

নবেম্বরের দিকে যখন আমাদের বিজয় ঘনিয়ে আসছিলো তখন বুদ্ধিজীবী হত্যার নকশা গ্রহণ করা হয়। নিলফামারী মহকুমা শহর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ব্যাংকের সব টাকা পুড়িয়ে ফেলায় নির্দেশ আসে। কয়েন পুকুরে ফেলে দিতে বলা হয়।

নীলফামারী ন্যাশনাল ব্যাংকের ভল্টে তখন এক কোটির ওপর টাকা ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আর্মি ক্যাম্প থেকে টেলিফোনে আমাকে জানানো হলো, আমার ব্যাংকের সব টাকা পরদিন খুব সকালে রংপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাকে টাকাসহ রেডি থাকতে বলা হলো। এদিকে টাকা যেন রংপুরে না নেওয়া হয় সে ব্যাপারেও মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে হুমকি দিল। আমি উভয় সংকটে! আর্মি ব্যাংকে টেলিফোন করে জানালো যে, টাকার বাক্স বানাতে হবে। এখন শহরে কার্ফ্যু চলছে আপনি সকালে আমাকে তিন ঘন্টা সময় দিন। মেজর সাহেব বুঝে রাজি হলেন। আমি সারা রাত না ঘুমিয়ে ব্যাংকের লোকদের খবর দিয়ে ভোরে ব্যাংকে হাজির হলাম। আমার স্ত্রী আমাকে নাস্তা খেয়ে যেতে বললে আমি তা পালন করতে পারিনি। সকাল নয়টায় আর্মির কনভয় ব্যাংকের সামনে হাজির হলো। আমি ইনভয়েস সাইন করতে বললে এক ক্যাপ্টেন রেগে গেল। আমাকে জোর করে গাড়ির সঙ্গে নিয়ে গেল। টাকা যাওয়ার ব্যাপারটা মুক্তিযোদ্ধারা জানতো। তাই আমি গাড়িতে বসে আল্লাহ আল্লাহ করছিলাম, রাস্তায় যেন কোনো ঘটনা না ঘটে। টাকাসহ আমাকে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হয়। রংপুর ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের সহায়তায় আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি পাই। আর কিছুদিন পর গোটা দেশ মুক্ত হয়ে যায়।

১৪৩/১ লেক সার্কাস কলাবাগান
ঢাকা

জয় বাংলা...

আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা?

হ্যাঁ মনের গভীর প্রদেশ থেকে বলছি, আমি ও আমার পরিবারের সকলে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তাই বলছি আমি দিবাকরের মতো একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা। ফয়জুন্নেছা স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। তখন সরকারের নির্দেশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত 'পাকিস্তান ওয়েলফার ন্যাশনাল গাইড উইথ নার্সিং' ট্রেনিং দিতো। ময়নামতি সেনানিবাস থেকে আর্মি গাড়িতে করে রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং দিতো। আর মাসে একবার সেনানিবাসের মাঠে নিয়ে ট্রেনিং দিতো। নার্সিং ট্রেনিং দিতেন একজন ইউরোপিয়ান মহিলা ডাক্তার। আর গার্লস গাইডের ট্রেনিংও স্কুল থেকেই পেয়েছি। এ সবের বদৌলতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে মনেপ্রাণে পরিবারের সবাইকে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং করতে সহযোগিতা করেছি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লার হাউজিংয়ের মাঠে সমাবেশ করেন। সেখানে গার্লস গাইডের দায়িত্ব পালন করি। সেদিন বক্তৃতামঞ্চ থেকে জাতির পিতা যেসব নির্দেশ জনগণকে দিয়েছেন, আমি মনেপ্রাণে সেসব নির্দেশ পালন আজও করছি। সভা শেষে ঢাকা যাওয়ার পথে, মিছিল করে মাননীয় আহাম্মদ আলী এডভোকেট সাহেবের বাসা পর্যন্ত গার্লস গাইডের দায়িত্ব পালন করি। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রশস্ত পথের সব কর্মেও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ও করার উৎসাহ এভাবেই আমার জীবনে সূচনা হয়। তাই আমি মনেপ্রাণে একজন মুক্তিযোদ্ধা।

আপনি কি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান?

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা মায়ের সন্তান। দুই মাস বয়সে বাবা মারা যান। ব্রিটিশ আমলের ম্যাট্রিক জিটি পাশ ছিলেন আমার মা। আর ৩ জন শিক্ষয়িত্রী নিয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়টি সরকার অনুমোদন করেছিল।

কুমিল্লাতে মা যে বাড়ি আমার ও আমার স্বামীকে কিনে দিয়েছেন ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সময় মা সেই বাড়িতে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসই এ বাড়িতে থেকে সব সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২.৩০ মিনিটে মা নামাজ শেষে তসবি জপতে জপতে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন বাড়ির সামনের মাঠে রাস্তার সঙ্গে শুকনো খাল ছিল তাতে অস্ত্র হাতে মাটিতে উপুড় হয়ে পজিশন নিয়েছে। আমরা লুকিয়ে আড়াল থেকে তাই দেখলাম ও মানসিক প্রস্তুতি নিলাম, ১.৩০ মিনিট থেকে গোলাগুলির আওয়াজ। রাত ২টায় দরজায় টোকা পড়লো। জানালা খুলে দেখি রাইফেল কাঁধে ৩ জন আহত বাঙালি পুলিশ, একজনের ৩টা আঙুল গুলির আঘাতে পড়ে গেছে। এভাবে ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত ১৭ জন পুলিশ ঘরে ঢুকলো, তারা প্রায় সবকজনই আহত। ট্রেনিং দেয়ার ওষুধ,

ব্যান্ডিজ, আয়োডিন যা আমার কাছে রক্ষিত ছিল। সব দিয়ে আমার স্বামী ও আমাকে নিয়ে শুশ্রূষা মাই প্রথম শুরু করে। সব রকম সেবা যেমন ভাত যা ছিল তারপর চিড়া মুড়ি যতটুকু সবাইকে দেয়া হয়, খুব তড়িৎগতিতে একজনের যে ৩টি আঙ্গুল পড়ে গিয়েছিল তা দিয়ে ব্যান্ডিজের ওপর দিয়েও রক্ত ঝরছে। তাকে আমার মা হাত দিয়ে খাইয়ে দেন। তার বাড়ি নবীনগর থানায় আহাম্মদপুরে।

আমার ছেলে কাউসারকে নিয়ে তাদের পোশাক, বুট, হ্যাট সবকিছু মাই নির্দেশ দিলেন পায়খানার ট্যাঙ্কি বড় আছে তার মধ্যে ফেলে দিতে। বুলেটগুলো চাউলের ডুলিতে রাখতে মা নির্দেশ দিলেন। পরক্ষণেই পুলিশ কোয়ার্টার থেকে নারী শিশুর চিৎকার দরজা ভাঙার আওয়াজে ইতিহাসের পাঠ্য বর্গী এল দেশে মনে করে দিল। এ সময় আমার মা বেশ জোর দিয়ে বলল, এতো লোক একসঙ্গে পাক আর্মি দেখলে সবাইকে মেরে ফেলবে। আমরা সোনামোড়া দিয়ে ২ বার পিকনিকে গিয়েছি। তাই মা এ পথটাকে অতি নিকটে তা জানতো। মা দরজা খুলে সবাইকে বলল, তোমরা ধান ক্ষেত দিয়ে তাড়াতাড়ি বর্ডার পার হয়ে যাও। তখন আমি তাদের বললাম গুলির মুখে তোমরা মাটিতে ক্রলিং করে এগিয়ে যাও। সকলেই বের হলো কিন্তু ইদ্রিস নামে শক্তিশালী ও বয়স কম সে কিছুতেই যাবে না। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অধিকাংশ কাজের নির্দেশ ও খাবার বেশি করে তৈরি করে যে আসল মুক্তিযোদ্ধা তাকেই খাইতে দেয়া, এগুলো মাই যত্নকার করতেন। এরূপ একজন বিশিষ্ট কর্মী শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা মায়ের গর্বিত সন্তান আমি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসপি থেকে যেসব পুলিশ অফিসার লাইনে কাজে যোগ দিয়েছে সকলেই আমার মায়ের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখা করে কুশলাদি জানতে চান।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি?

আমি বাঙালি বাংলা আমার, পাখির কলতান ও সবুজের সমারোহের নদীমাতৃক এ দেশের বুকে যখন বর্বর ইয়াহিয়ার পাক জল্লাদবাহিনী ও এ দেশের কিছু রাজাকারদের অপশক্তির বিরুদ্ধে মনেপ্রাণে সোচ্চার হওয়ার জন্য জাতির জনক ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের ভাষণে সদর্পে, বজ্রনিনাদ কণ্ঠে বাঙালি জাতির প্রতি ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। বর্বর পাক বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবো ইনশাআল্লা'। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন যে, তোমাদের যার যা হাতিয়ার আছে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা কর।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই সিভিল ডিফেন্স অফিসার আনোয়ার সাহেবের নির্দেশে কুমিল্লা কলেজে নার্সিং ট্রেনিং ও রাইফেল ট্রেনিং

আমার বাড়ির সামনে মাঠে ও পুলিশ লাইন পশ্চিম ও দক্ষিণ কর্নারে এবং বড় রাস্তার পাশের শুকনা খালে আধুনিক অস্ত্র হাতে মাটিতে উপুড় হয়ে পজিশন নেয় এবং লাইনের পশ্চিম দক্ষিণ কর্নারে মেশিনগান ফিট করে। ১.৩০ মিনিটে শুরু হয়। গোলা-গুলি আর চিৎকারের আওয়াজ। তারপর শুরু হয় লাইনের কোয়ার্টারগুলোর দরজা ভাঙার আওয়াজ

দেওয়াচ্ছিলাম। আমি, তাজু ভাই, পাখী ভাই, রউফ ভাই। এ সময় আমার ছেলে পরিবারের অন্যরা অনেক প্রকারেই সহযোগিতা করে।

পুলিশ লাইন সংলগ্ন আমার বাসা তাই ২৫ মার্চ ১.৩০ মিনিটে যখন পাক আর্মিরা পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে তখন অনেক আহত পুলিশকে আশ্রয় দিয়েছি, আহতদের সেবা করে বাড়ির পেছনের পথ দিয়ে সোনামোড়ার দিকে যেতে সাহায্য করেছি। পুলিশদের ১৭ রাইফেলের মধ্যে ১৬টা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দিয়েছি। তারপর পুলিশদের বুলেটগুলো সোনামোড়া পাঠাবার সময় লোকটা গুলিগুলো কোনদিকে নিয়ে যায় দেখে আর্মি বলে আমার ছেলে বাড়ির পেছনে গেল তারপর আর ঘরে ফিরলো না। তিন দিন পর শুনলাম সে সোনামোড়া ক্যাম্পে ট্রেনিং দিচ্ছে এবং ৭৫ টাকা করে দৈনিক পায়। এভাবে আর্মি ট্রাকে করে মেঘালয় পাঠায়। এ জায়গায় এক অপারেশনে পাক আর্মিদের সঙ্গে গুলিতে ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনই মারা যায়। আমার ছেলে কাউসারেরও গ্রেনেডের টুকরো উরুর মধ্যে লেগে রক্ত ঝরতে থাকে। সে অচেতন হয়ে যায়। সন্ধ্যা যখন ৭টা তখন যেন তার মনে হচ্ছে সে বেঁচে আছে অর্থাৎ তখন তার চেতনা আসে। সে চিৎকার দিলে কয়েকজন লোক এসে তাকে তোহা হাসপাতালে ভর্তি করে। অনেক কষ্টে কাউছার ৬ ডিসেম্বর বাসায় আসে। এভাবে আমি ও আমার পরিবারের সকলে জীবনমৃত্যু বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। সহযোগিতা করেছি। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে অনুধাবন করেই এগিয়ে চলেছি। তাই বলছি আমি একজন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি!

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কি আপনার হৃদয়ে লাল সবুজ পতাকার মতো?

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ বিকাল ৪টায় সিভিল ডিফেন্স অফিসার আনোয়ার সাহেবের নেতৃত্বে তাজ ভাই, নাজমুল হাসান পাখী ভাই, মমতাজ, শরিফুন্নেছা আপা, আমি সামসুন নাহার একটা শ্রেণী কক্ষের ভেতরে নার্সিং ট্রেনিং ও রাইফেল ট্রেনিং দিচ্ছিছিলাম। এতোদিন মাঠেই ট্রেনিং দিতাম। যখন বিশ্বস্ত সূত্রে খবর আসল কুমিল্লা এয়ারপোর্টে প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আসছে এবং বিশ্বরোড দিয়ে তা ময়নামতি সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখনই এ কথা শুনে আনোয়ার সাহেবের নির্দেশে শ্রেণী কক্ষের সকল বেঞ্চ একদিক স্তূপ করে ভেতরেই ট্রেনিং দেয়া হতো।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২.৩০ মিনিটে পুলিশ লাইনের ভেতরে, কান্দিরপাড় নজরুল এভিনিউ, সকল স্থানে একযোগে জল্লাদ বাহিনী আক্রমণ করে। আমার অতি আপন মানুষগুলো অতীন্দ্র ভদ্র, যতীন্দ্র ভদ্র, অজয় দত্ত, ধীরেন্দ্র দত্তের বাড়ি ঘেরাও করে গুলি করতে করতে সব শেষ করে দেয়।

সবুজের সমাহার এ দেশের প্রাকৃতিক শোভা আর রাজপথ থেকে গ্রামেগঞ্জে, অলি-গলি, খালে-বিলে অগণিত শহীদের রক্তের ঢেউ। রক্তে রঞ্জিত এ দেশের আকাশ বাতাসও যেন কম্পিত হয়ে উঠলো।

হানাদার বাহিনী যখন কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ ছাড়ত তখন হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু আমার বাড়ির পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে ক্ষেতে কাদা পানি নদী ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সোনামোড়া আশ্রয়ের জন্য দৌড়াতো।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা আপনার আছে কি?

কুমিল্লায় মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয় পুলিশ লাইনে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২.৩০ মিনিট থেকে পাক হানাদাররা আমার বাড়ির সামনে মাঠে ও পুলিশ লাইন পশ্চিম ও দক্ষিণ কর্নারে এবং বড় রাস্তার পাশের শুকনা খালে আধুনিক অস্ত্র হাতে মাটিতে উপুড় হয়ে পজিশন নেয় এবং লাইনের পশ্চিম দক্ষিণ কর্নারে মেশিনগান ফিট করে। ১.৩০ মিনিটে শুরু হয়। গোলা-গুলি আর চিৎকারের আওয়াজ। তারপর শুরু হয় লাইনের কোয়ার্টারগুলোর দরজা ভাঙার আওয়াজ। নারী, পুরুষ আর শিশুর চিৎকারের আওয়াজে মনে হলো ইতিহাসের 'বর্গী এল দেশের' কথা। নারী শিশুর চিৎকার বর্গী এল দেশের সময়কেও যেন হার মানিয়েছে।

রাত ৪টা পর্যন্ত আমার বাসার আশ্রয় নিল ১৭ পুলিশ। তারা প্রায় সকলেই আহত। তাদের সেবা, পোশাক বদলে অন্য পোশাক দেয়া, যতটুকু সম্ভব খাবার দেয়া, পরে ৪টার

দিকে পেছনের দরজা দিয়ে তাদের সোনামোড়া যেতে সাহায্য করা এসব আমি এবং পরিবারের সকলে মিলেই করি। এর মধ্যে লাইন দারোগা প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী ও মেয়েরা বাড়ির পিছন দিয়ে ঢুকে আশ্রয় চেয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, বাবা ও ভাইকে মেরে ফেলছে। তাদের আশ্রয় দিলাম। এরূপ যুদ্ধচলাকালীন দিনগুলো আরো অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। যার শেষ নেই।

পরোক্ষ অভিজ্ঞতা : পরোক্ষ যা শুনেছি তা পরোক্ষ। ১৯৭১ সালের ঈদুল ফিতরের দিন, ফজরের নামাজের আজান মসজিদ থেকে ভেসে আসছে। এ সময়ই দাউদকান্দির গোয়ালমারী এলাকার চৌধুরী বাড়ির মসজিদ থেকেও আজানের সুমধুর শব্দ ভেসে আসছে। এ বাড়িতেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। একদিকে আজানের ধ্বনিতে মুখরিত এলাকা অথচ এ সময়েই পাক হানাদার বাহিনীর মর্টারের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের সঙ্গে জনগণের চিৎকার। মুক্তিযোদ্ধারা সোনাকান্দা পীরসাহেবের বাড়িতে ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলির আওয়াজে রণক্ষেত্রে পরিণত হলো গোয়ালমারী। ভোর ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রচন্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে মতলবের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী। এ স্থানের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় ২৩ জন। দাউদকান্দি এবং মতলবের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণে তারা পিছু হটে। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ৭০ জন পাক আর্মি নিহত হয়।

গোয়ালমারীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এ স্থানে স্মরণসভা হয়, দোয়া মাহ্‌ফিল হয়। গোয়ালমারী মুক্তিযুদ্ধ আমার মুক্তিযুদ্ধের জীবনে পরোক্ষ ঘটনা।

অজানা কোনো ঘটনা কি আপনি জানেন?

অজানা ঘটনার মধ্যে যা বাঙালি রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা ভাষা রাখার জন্য জীবন দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বর্ষীয়ান নেতা, জ্ঞানী, গুণী, দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম কে না জানে। আমি উনাকে স্মরণ করি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং উনার ছেলেকে পাক জল্লাদ বাহিনী ধর্ম সাগরপারের উনার বাড়ি থেকে আর্মি গাড়িতে করে ময়নামতি সেনানিবাসে নিয়ে যায়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কর্ম জীবনের প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। বার বারই এ জন্য তার ওপর জুলুম চলছে। তার গ্রামের বাড়ি আমার গ্রামের পাশে। সে বদৌলতে পাক সেনাদের যারা রান্না করতো তাদের বাড়ি আমার গ্রামে। তার কাছ থেকে উনার ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলছিল তা শুনেছি। ছড়ি দিয়ে পিটান, রিভলবার দিয়ে মাথায় আঘাত করা এমন কি ব্লেড দিয়ে শরীরের চামড়া কেটে লবণ আর লেবুর রস লাগানো এসব ঐ বাবুর্চির মুখ থেকে শুনেছি।

পাক আর্মিরা বলতো, বল উর্দুই হবে এ দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। উনি বলতো, না আমি বাংলার বাংলা আমার, এ দেশের রাষ্ট্র ভাষাও বাংলাই হবে। আর শহীদ ধীরেন্দ্রনাথই ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনকারী। রাজনৈতিকভাবে এটাই ছিল বাঙালির ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন। স্পর্ধিত সাহস নিয়ে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম এ লড়াই শুরু করেছিলেন। এভাবে কিছুদিন চলার পর আর উনার ও উনার ছেলের খবর মিলে নিই। এভাবেই চোখে দেখা সত্যিকারের ঘটনাও অজানা রয়ে গেল।

সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন বা দেখেছেন?

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাতে পাকবাহিনীর জল্লাদরা কুমিল্লার পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে। মাত্র ১৪ দিন আগে ভর্তি হয়েছে সব নতুন পুলিশ, অথচ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর প্রচন্ড গুলি, মর্টারের গুলির মুখে পুলিশ লাইনের অধিকাংশ পুলিশই নিহত হয়। দেয়াল টপকে পশ্চিম দিকে যারা এসেছিল তারা ভীত হয়ে আসেনি। দেয়ালের ওপর দিয়েই তারা গুলি ছোঁড়ে। লাইনের পশ্চিম দক্ষিণ কর্নারে যে কয়জন মেশিন গান থেকে গুলি ছুঁড়ছিল, দেয়ালের ভেতরে যে কয়জন পুলিশ আসলো হঠাৎ দেখি তারা একসঙ্গে মর্টারের কাছে পাক আর্মিগুলোর দিকে গুলি ছুঁড়ল ৪ জন মাটিতে পড়ে গেল। বাকি কয়জন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে লাইনের ভেতরের দিকে দৌড়াল। এদিকে আমার ছেলের সঙ্গে দেয়ালের ভেতরের ৫ জন পুলিশ ঘরে ঢুকলো আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা দিল আমরা বাঙালি পুলিশ, আশ্রয় দেন। এবার দেখি সব কয়জনই আহত। একজনের ৩টি আঙুল নেই, রক্ত ঝরছে। মোট ১৭ জন। তাদের বুট, হ্যাট, পোশাক বদলান। রাইফেল বুলেট রেখে সব পায়খানার ট্যাঙ্কিতে ফেললাম। ভাত, চিড়া, মুড়ি যা ঘরে ছিল মা তাদের খাওয়ালেন। চাদর, ধুতি, লুঙ্গি তাদের পরতে দিল। পুলিশ লাইনে গুলি ও নারী শিশুর চিৎকার আমার মা তাড়াতাড়ি পুলিশদের বলল তোমরা পেছনের পথ দিয়ে সোজা ধানক্ষেত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাও। এভাবে তাদের পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয়া হলো। এভাবে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে দেখেছি, সাহায্য করেছি নিজ হাতে। যুদ্ধ করার এই মুহূর্তে সময় ছিল না। পরের দিন লিয়াকত টেকনিকেলে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আমি ছেলেকে গ্রেনেড ছুঁড়তে সাহায্য করি। ২৯ মার্চ, রাইফেলের গুলি নিয়ে সোনামোড়া ক্যাম্পে চলে গেল। ক্যাম্প থেকে কাউসারকে মেঘালয় পাঠালে সেখানে মুক্তিযুদ্ধে ১৪ জনের ১৩ জন শহীদ হয়। আমার ছেলে কাউসারও গ্রেনেডের টুকরো উরুতে লেগে অজ্ঞান হয়েছিল। পরে লোকজনের সহায়তায় তোহা হাসপাতালে যায়। ৬ ডিসেম্বর বাসায় আসে। এভাবে বুকের দরদ দিয়ে যুদ্ধ করেছি, সাহায্য করেছি। সবকিছুই স্মৃতির পাতায় লাখো শহীদের রক্তের বিভীষিকা হয়ে আছে।

যেকোনো রকমের সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের?

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের সফলতার জন্য আমি আমার ছেলে কাউসার ও পরিবারের সকলে সকল প্রকার সীমাহীন সহযোগিতা করেছি। পাশের বাড়ির লোক ছিল বিখ্যাত রাজাকার। তার মুহুরি ছিল এক সময়ের ছাত্র। সে ভাত খেতো আমার বাসায়।

পাক জল্লাদবাহিনী গাড়ি করে আসতো। রাজাকার বা বিভিন্ন বাড়ির অবস্থান বলে দিতো। তারা বাড়ি আক্রমণ করে হত্যাযজ্ঞ চালাতো। যেমন অতীন্দ্র ভদ্র, যতীন্দ্র ভদ্র, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত- এ সমস্ত জ্ঞানী গুণী লোকজনই ছিল বেশি। গাড়ি দিয়ে তাদের তার বাড়িতে আনতো। অনেক প্রশ্ন করতো। আবার পাক আর্মিদের গাড়ি দিয়ে ময়নামতি সেনানিবাস নিয়ে যেতো। রাজাকার ২-৪ বার আমাদের বলেছে এখান থেকে চলে যেতে, নতুবা অসুবিধা হবে।

ইতিমধ্যে এক ভিক্ষুক এলো বন্দুকের গুলি নিতে চিরকূট দেখে, উপরে আম দিয়ে ঢেকে যা পারলাম দিলাম। তার পরদিন আবার আসলে বাকি গুলি আমের ব্যাগে দিলাম। ছেলে সন্দেহ করে এগুলো ময়নামতি নেয় কি না দেখি। বাড়ির পেছন দিকে গেল, আর আসে না। ৩ দিনপর শুনলাম সে সোনামোড়া ক্যাম্প ট্রেনিং নিচ্ছে দৈনিক ৭৫ টাকা পায়, এরপর মেলাঘর 4th Bengal-এ। তাকে রিক্রুট করা হয়। সে ছিল বি কোম্পানিতে। এখানের ট্রেনিং শেষে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রাকে করে তাকে মেঘালয় ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানের সেকসান কমান্ডার ছিলেন নায়েক শাখাওয়াত ও প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন মোসলেউদ্দীন। এখানে নকশী বিওপি যার Brifing-এ উপস্থিত ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান।

এদিকে ছেলে নেই বলে আমি ও আমার পরিবারের সকলের মুক্তিযুদ্ধের কাজের শক্তি ও সহযোগিতা যেন আরো বেড়ে যায়।

নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাউছারসহ ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা এক অপারেশনে গেলে পাক জল্লাদরা তাদের ঘিরে ফেলে প্রচন্ড গুলাগুলির মুখে মুক্তিযোদ্ধারা নিহত হয় ১৩ জন, পাক হানাদারের লাশ পড়ে থাকে ৯ জন। কাউসারের উরুতে গ্রেনেডের টুকরো ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার হুঁশ হলে চিৎকার দিয়ে বলে, বাঁচাও। তখন কারফিউমুক্ত ছিল। লোকজন এসে নিয়ে তাকে তোহা হাসপাতালে ভর্তি করে। অপারেশন করে গ্রেনেডের টুকরো বের করা হয়। এভাবে ১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর অনেক কষ্টে কুমিল্লা বাসায় ফিরে আসে।

এরূপ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে ৯ মাস যুদ্ধ করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

লেখাটিতে নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি

সুনামগঞ্জের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ

মতিউর রহমান

রাত আনুমানিক বারোটা। দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ। সারাদিন মিটিং-মিছিল শেষে সবে মাত্র টেবিলে ঢাকা ঠান্ডা কড়কড়ে ভাতের থালায় হাত দিয়েছি। থালা একপাশে রেখে দরজা খুলে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন তৎকালীন সময়ের সুনামগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা হোসেই বখত।

উনি বললেন, এক মুহূর্ত দেরি না করে ছাত্রলীগের যাদেরকে পাওয়া যায় তাদেরকে নিয়ে সংসদ সদস্য দেওয়ান ওবায়দুর রাজা সাহেবের বাড়িতে হাজির হওয়ার জন্য। কারণ এই মাত্র সুনামগঞ্জ থানার ওয়ারলেস মারফত খবর পাওয়া গেছে যে, পাক সেনারা ঢাকা সেনানিবাস থেকে বের হয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ বিভিন্ন জায়গায় হামলাসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

উনার কথা শুনে নিত্যসঙ্গী সাইকেলখানা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে দেওয়ান ওবায়দুর রাজা সাহেবের বাসায় গিয়ে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, শহরের ছাত্র-শিক্ষক-ব্যবসায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী হতে শুরু করে প্রাক্তন সেনা বাহিনীর সদস্য, আনসার মুজাহিদসহ সব শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে সভা চলছে। সভায় ঢাকার পরিস্থিতি আলোচনা এবং এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী তা নিয়ে কথা হচ্ছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় সিলেট হতে যাতে সড়কপথে পাক সেনারা সুনামগঞ্জ না আসতে পারে তার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সুনামগঞ্জ শহর হতে ১৪ মাইল দূরে ডাবরের ফেরিঘাটের ফেরিটি অচল করে দেয়া। এ দায়িত্ব দেয়া হয় প্রাক্তন মুজাহিদ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মালদার আলী, তারা মিয়া ও আমার ওপর। আমাদেরকে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডাবর রওনা হয়ে কাজ সমাধা করে আসার জন্য। রাজা সাহেবের একখানা জীর্ণ পুরাতন জিপ ছিল। আমরা সেই জিপ নিয়ে রাত ২টার সময় ডাবরের উদ্দেশে রওনা হই। তৎকালীন সময়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তা কাঁচা ছিল। রাস্তায় ছিল বড় বড় বোল্ডার। সুনামগঞ্জ হতে সিলেট ৪০ মাইল রাস্তা যেতে কোনো কোনো দিন ৮ থেকে ১০ ঘন্টা সময় লাগত। অনেক কষ্টে রাত ৪টার সময় আমরা ডাবর ফেরিঘাটে পৌঁছে ফেরিঘাটে পৌঁছে দেখি ফেরিঘাটে বাঁধা আর নদীর তীরে ছোট্ট ঘরে ফেরির চালকরা গভীর ঘুমে অচেতন। আমরা দরজায় গিয়ে ফেরির চালকদের ঘুম থেকে ওঠার জন্য ডাক দিলে তাদের মধ্য হতে একজন বলে যে, এত রাতে ফেরি পার করে দেয়া সম্ভব নয়। তারপর দরজায় ধাক্কা দিয়ে আরেকবার ডাক দিলে ঘরের ভেতর থেকে গালিগালাজ শুরু করে। তখন রাইফেলের বাঁট দিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করলে তারা ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। তাদের দিকে রাইফেল তাক করে আমরা বলি যে, আমরা ডাকাত নই এবং সবাইকে যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই আমাদের সঙ্গে ফেরিতে গিয়ে উঠতে। ফেরিতে উঠে ফেরি চালু করে আমরা দুই মাইল দূরে দুরহাড়য় ফেরি নিয়ে গিয়ে কাঠের ফেরির পাটাতন ও ইঞ্জিন ভেঙে আমরা সকাল ৯টার সময় সুনামগঞ্জে ফিরি। ২৬ মার্চ সারা দিন রেডিও'র খবর শুনে কাটে। দেশের অবস্থা কী হবে? আমাদের কী করণীয়? এই সমস্ত বার বার মনে উঠতে থাকে।

২৭ মার্চও সারা দিন উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটে। সন্ধ্যার সময় বর্তমান আলফাত উদ্দিন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ দেখি হেডলাইট নেভানো একখানি জিপ ঝড়ের গতিতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। জিপখানি সুনামগঞ্জ থানায় প্রবেশ করে। জিপে একজন বাঙালি ক্যাপ্টেনসহ ১০ জন পাকিস্তানি সেনা ছিল। থানা কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিলে তারা মহকুমা জনসংযোগ কর্মকর্তাকে ডেকে এনে কারফিউ জারির ঘোষণা প্রচার করতে বলে। জনসংযোগ কর্মকর্তা কাউকে না পেয়ে রিকশা নিয়ে নিজেই কারফিউ জারির ঘোষণা প্রচার করতে শুরু করে। মাইক নিয়ে ষোলঘর পয়েন্টে গেলে তৎকালীন সময়ের ছাত্রলীগ কর্মী জনসংযোগ অফিসারের কাছ হতে মাইক কেড়ে নিয়ে পাকবাহিনীর সুনামগঞ্জে আগমনের বার্তা প্রচার করতে থাকে, সেই সঙ্গে এদের প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানাতে থাকে। পাকবাহিনীর থানা থেকে ডাকবাংলোয় আস্তানা গেড়ে রাতে নেতৃবৃন্দের বাসায় হানা দেয় কিন্তু তাদের কাউকেই পায়নি।

পরদিন ২৮ মার্চ পাকবাহিনী সুনামগঞ্জে বাজারে বের হয়ে কয়েকজনকে মারপিট করে ডাকবাংলোয় ফিরে যায়। সকাল ১০টার দিকে সুনামগঞ্জ কলেজের ভিপি হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, ছাত্রলীগ নেতা সুজাত চৌধুরী, তালেব উদ্দিন প্রমুখের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি পুরাতন কোর্টের সামনে এলে মিছিল লক্ষ্য করে পাক বাহিনীর সদস্যরা গুলি ছুঁড়ে। মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে রিকশা শ্রমিক গণেশ প্রাণ হারান। সুনামগঞ্জের মাটি শহীদ গণেশের রক্তে প্রথম সিক্ত হয়।

শহীদ গণেশের মৃত্যু সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। পাক বাহিনী সুনামগঞ্জে আসার আগে সুনামগঞ্জ ট্রেজারি অস্ত্রাগার হতে যে সমস্ত রাইফেল আনসার, মুজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ হয়েছিল সে সমস্ত অস্ত্র দিয়ে পাকবাহিনীর অবস্থান পুরাতন ডাক বাংলা লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছোঁড়া হয়। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সামরান আলী, আশ্রব আলী, মনোয়ার বখত নেক, কামাল মিয়া, আব্দুল হাসিম মালদার আলী প্রমুখ।

শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি তুমুল যুদ্ধ। চারদিক থেকে ডাকবাংলো ঘেরাও করে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়। গার্লস হাইস্কুলের দিক থেকে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানোর সময় আনসার কমান্ডার সাহসী যোদ্ধা আবুল হোসেন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনের দিকে ক্রলিং করে এগুতে থাকেন। হঠাৎ উনি মাথা তুললে একটি গুলি এসে আবুল হোসেনের গায়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাণ হারান।

আবুল হোসেন শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে শুরু হয় জোর আক্রমণ। কিন্তু পাকবাহিনী ডাকবাংলোর নিরাপদ আস্তানায় থাকায় তাদেরকে ঘায়েল করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবুও চলতে থাকে উভয় পক্ষের অনর্গল গুলিবর্ষণ। এমতাবস্থায় বিকাল ৪টার দিকে সুনামগঞ্জ মহকুমার এসডিও-এর মাধ্যমে সাদা পতাকা তুলে তাদেরকে নিরাপদে সুনামগঞ্জে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার প্রস্তাব জানায়। তখন জনতা এসডিও মোকাম্মেলকে পাক বাহিনীর দালালী করার জন্য তার ওপর হামলা চালায়। আক্রমণের ফলে রামদার আঘাতে মোকাম্মেল আহত হন।

তারপর শুরু হয় আবার উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি। মুক্তিকামী যোদ্ধা ও জনতা পাক বাহিনীকে সারা দিন ঘেরাও করে রাখে। গভীর রাতে হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়-বৃষ্টির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কেউ জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে, কেউ কেউ গার্লস হাই স্কুলের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। পাকবাহিনী ঝড়-বৃষ্টির সুযোগে তাদের মধ্যে আহত তিন সঙ্গীকে ফেলে পলায়ন করে। রাত পোহালে সকালবেলা মুক্তিযোদ্ধারা ডাকবাংলো লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া শুরু করলে পাল্টা কোনো জবাব না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধা জনতা মিলে ডাকবাংলোর দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করলে একজন পাকসেনা ডাকবাংলোর পেছন দিকে দৌড়াতে শুরু করে। তাকে ধাওয়া করে জনতা ধান ক্ষেতের দিকে নিয়ে দেশীয় অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে এবং আহত বাকি দুজনকে বন্দি করে হাসপাতালে স্থানান্তর করে। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। এভাবে শেষ হয় সুনামগঞ্জের বীর জনতার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ।

লেখাটিতে ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি

আমার শহীদ পিতা

মোঃ কামরুল হাসান

ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আবাসিক এলাকার সবুজ মাঠে একদল তরুণকে দেখলাম সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ নিতে। সময়টা মার্চের প্রথম ভাগ, ১৯৭১। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। রাস্তায় অগণিত মিছিল। একটি মিছিলে নারী-পুরুষ মিলে গাইছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' ব্যানার বহন করছে ছাত্রছাত্রীরা। আমরা থাকি ১১/এ ফুলার রোড আবাসিক এলাকায়। আমার বাবা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের একজন সিনিয়র শিক্ষক। আমাদের বাসা থেকে সহজে রাস্তা দেখা যায়। মিছিল এলেই আমি দৌড় দিতাম সদর রাস্তায়। মিছিলের স্লোগান, মানুষের উত্তোলিত হাত, ব্যানার, পোস্টার- খুবই বর্ণিল ও ছন্দময় সেই মিছিল। ছাত্রদের মিছিল, ছাত্রীদের মিছিল ও শ্রমিকদের মিছিল। দু-একটি স্লোগান মনে আছে- ভুট্টোর মুখে লাথি মার- বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ভুট্টোর মুখে জুতা মার বাংলাদেশ স্বাধীন কর। এবং জয় বাংলা।

মাইকে বাজছে 'জয় বাংলার জয়' গান। ঐ গানের অসাধারণ প্রণোদনা, আমার বয়স তখন ৭ থেকে ৮। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' এ গানও বাজতো।

আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনরা আসতো, থাকতো। রাজনীতির নিয়ে হতো দীর্ঘ আলাপ। আমি তখন রাজনীতি বুঝি না। ভালো লাগে মিছিল দেখলে। জয় বাংলা আর সংগ্রামী গানের সুর যেন সব সময় মাথায় বেজে চলত।

বাবা রেডিওতে ৮ মার্চ শেখ মুজিবের রেকর্ডকৃত ভাষণ শুনছেন। আমার মা পাশে বসে আছেন। বাবাকে আনন্দ মিশ্রিতভাবে ভাবিত মনে হলো। আমাদের বাসায় আমার চাচা ও মামা থাকেন। মিছিলের ছন্দ ও ঘরে ঘরে কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা দেখে আমার মনে শখ হলো একটি পতাকা ওড়াবার। বাংলাদেশের লাল-সবুজ ও হলুদ মানচিত্রের পতাকাটি তৈরি সহজ নয়। তাই কালো পতাকা বানানোর ইচ্ছা হলো। মাকে বললাম। মায়ের কাপড় কেটে বানানো হলো কালো পতাকা। একটি ছোট বাঁশে সেই পতাকা বেঁধে সারা মাঠ দৌড়িয়ে ঘরের বারান্দায় কালো পতাকাটি রাখা হলো। কিন্তু ঐ কালো পতাকাটি হয়তো আমাদের জন্য বিপদ বয়ে এনেছিল।

ঘরে ঘরে প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এর আগে আমার চাচা ও মামা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে একটি লোহার রড নিয়ে এলেন। রাস্তায় বড় গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছে। চারদিকে উত্তেজনা। আবার আমার মামার মাঝে স্বাধীনতার আনন্দ। আনন্দে তিনি পিতলের থালা বাজাচ্ছেন। আমাদের আবাস ভবনের উপরে পাশে অবাঙালিদের আবাস। আমাদের পাশের বাসায় ড. কিদওয়াই সপরিবারে অনেকদিন হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। দোতলায় পশ্চিম দিকে ড. সাবের থাকেন। দোতলার অন্য প্রান্তে থাকেন বাঙালি ড. আকতার। তার ছেলেমেয়ে বাপ্পী ও উর্মি আমার খেলার সাথী। ড. কিদওয়াই কিছুটা অসহিষ্ণু ধরনের ছিলেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। প্রায় প্রতিটি ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে কালো পতাকা উড়ছিল। এক মোহনীয় দৃশ্য। সে তুলনায় ফুলার রোডের আবাসিক এলাকায় পতাকা তেমন উড়ছিল না। এরপর এলো ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাত। গভীর রাতে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। গোলাবারুদের আওয়াজ একনাগাড়ে চলছিল। আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গেলো। সলিমুল্লাহ হল থেকে আমাদের এক আত্মীয় আমাদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। ভোরে সবার খেয়াল হলো বারান্দায় একটি পতাকা রয়েছে। আমার চাচা সে পতাকাটি সরাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। বাইরে পাকিস্তানি আর্মি সর্বদা সতর্কাবস্থায় ছিল।

ভোরে দরজায় সজোরে লাথি মারা শুরু হলো। পাকিস্তানি সৈন্যরা উন্মত্ত। তারা দরজার কড়া নাড়ছে না। তাদের বুটের লাথির আঘাতে ইতিমধ্যে দরজায় ফাটল দেখা দিয়েছে। বাবা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন দরজা খুলে সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে ফিরাবেন। বাবাকে দেখলাম লুঙ্গি পরা অবস্থায় শার্ট পরে দরজা খুলতে যাচ্ছেন।

দরজা খোলা হলো। সামনে দাঁড়িয়ে হায়েনার দল। বাবা কথা বলার চেষ্টা করলো। তাদের উগ্রমূর্তি। তাদের উত্তেজিত উচ্চস্বর। দূরে আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। কানে ভেসে এলো জয় বাংলা নিয়ে কথোপকথন। বাবার কণ্ঠে নিম্নস্বর। সৈন্যদের কণ্ঠ উচ্চকিত। গুলির শব্দ। বাবা লুটিয়ে পড়লেন। সৈন্যদল ঘরে প্রবেশ করল। গুলির শব্দে আমার মা, মামা ও চাচা কেঁদে উঠলেন। সবাই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। আমার মার কোলে তখন আমার ছোট বোন। আমি, ছোট ভাই, আরেক বোনসহ আমাদের আত্মীয়রা খাটের নিচে লুকিয়েছিলাম। আমার মার কোলে অবুঝ শিশু দেখে কি না জানি না, ঘাতকদল নিশ্চুপ হলো। আর কারুকে মারল না।

ঘাতক সৈন্যরা চলে যাবার পর বাবাকে ধরাধরি করে বিছানায় নেয়া হলো। রক্তে স্নাত মেঝে। দুহাত গুলিবিদ্ধ। গলায় বেয়নেট চার্জ। নৃশংসতার চরম প্রকাশ। বাবা ইশারায় পানি চাইলেন। খেতে পারলেন না। মা বারবার বলেছিলেন ডাক্তারের কথা। আমাদের বাসার সামনে ছিলেন ডা. মোর্তুজা (পরবর্তীতে শহীদ)। বাইরে সৈন্যদের উপস্থিতি ও হিংস্রতার জন্য হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব হলো না।

ইতিমধ্যে আমাদের হলের আত্মীয়কে আর্মিরা জেরা করল। তিনি ক্ষমা চাইলেন। আনুমানিক সকাল ১১টা ও বিকাল ৩টার দিকে সৈন্যরা আবার এলো। সকাল ১১টায় আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। সবার কান্নার আওয়াজে কি না জানি না সৈন্যরা গুলি করল না। বিকেলে এসে সৈন্যরা আমার চাচা ও মামাকে বলল লাশ বহন করে বাইরে নিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে আমাদের হলের আত্মীয় আমার বাবার বন্ধু ও প্রতিবেশী ড. আজহারের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন।

ঘাতক সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং বাবার লাশকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা আমাদের ঘর ছাড়লাম। বাইরে কার্ফ্যু ও দেখামাত্র গুলি করা হবে এমন অবস্থা বিরাজমান। এই অবস্থায় মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আমরা ফুলার রোডের ১৪/এইচ ড. আজহারের বাসায় আশ্রয় নিলাম। ১৪ নং ফ্ল্যাটের একটি দোতলা বা তিনতলার একটি ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা ছিল এবং আসবাবপত্র অগোছালো ছিল। আমার কাছে মনে হলো পাকিস্তানি আর্মিদের ধোকা দেয়ার জন্য আসবাবপত্র অগোছালো রাখা হয়েছিল।

ড. আজহারের বাসায় আমরা রাত কাটালাম। চারদিকে অন্ধকার। কেউ আলো জ্বালায়নি। জানালা দিয়ে আমাদের বাসাটি দেখলাম। বাবা ওখানে একা শুয়ে আছে। নিথর দেহ। রক্তাক্ত মেঝে। অন্তরটি ডুকরে কেঁদে উঠলো। বাবাকে চিরদিনের জন্য হারালাম। ভেতরে হাহাকার। আসার আগে দেখেছিলাম বাবার কপালে লাল পিঁপড়ার দল। যে খাটে বাবাকে শোয়ানো হয়েছিল, তার নিচে একটি লোহার বালতি। তাতে জমাট রক্ত। বিছানার তোষক রক্তে ভেজা।

পরদিন ২৭ মার্চ। ফুলার রোডের অনেক বাসিন্দারা দ্রুত বাসা ছেড়ে গ্রামের দিকে বা নিরাপদ স্থানে রওয়ানা হয়েছে। একটি পরিবারকে হাঁড়িপাতিল নিয়ে রওয়ানা হতে দেখলাম। অন্যদিকে আমার বাবার লাশ একটি চৌকিতে করে ১১ নং বাসার সামনে রাখা হয়েছে। বাবার রক্তাক্ত শরীর। গায়ে একটি কেরোলিনের অ্যাশ কালারের শার্ট। পরনে লুঙ্গি। নিজেদের খুবই অসহায় মনে হলো। দলে দলে আতঙ্কগ্রস্ত লোকজন লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখলাম না লাশের পাশে এসে দাঁড়াতে। কেউ আমাদের সহানুভূতিও জানালো না। বাবার মৃত্যুর চেয়ে মানুষের এই আচরণ আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল।

নিজেদেরকে মানুষ মনে হচ্ছিল না। এতকিছুর মাঝে ড. আজহার ও ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (পরবর্তীকালে শহীদ) আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিলেন। ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তার লাল রঙের গাড়িতে করে পুরানা পল্টনে ড. আজহারের আত্মীয়ের বাসায় রেখে এলেন। ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বড় ছেলে সুমন আমার ক্লাসমেট ছিল।

আমার চাচা ও ড. আজহারের এক ভাতিজা ইদ্রিস সাহেবের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে আমার বাবাকে ২৭ মার্চ ১১ নং বাসার পেছনে কোনোরকমে কবর দেয়া হলো। (কবরটি আজো আছে)। ড. আকতারের বাসা থেকে সংগৃহীত এক বোতল ফ্রিজের পানি দিয়ে বাবাকে গোসল করানো হয়েছিল। বিছানার চাদর দিয়ে তৈরি হয়েছিল কাফন। পুরানা পল্টনে আমাদের পরিবার ও অন্যান্য বাঙালিরা নিরাপত্তার জন্য সম্ভবত একটি অবাঙালি পরিবারের বাসায় রাত যাপন করতাম। ইতিমধ্যে ঢাকায় শুরু হয়েছে নতুন করে পাকিস্তানি পতাকা তৈরির পালা ও উত্তোলন পর্ব। এরপর ৩-৪ দিন আমরা ঢাকায় থাকার পর আমাদের গ্রামের বাড়ি ভোলায় রওনা হলাম। সেখানে আমার নানা (যিনি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন)। আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। আমরা পাড়ি দিলাম দীর্ঘপথ। নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি একতলা লঞ্চে আমরা চাঁদপুরের দিকে রওনা হলাম। লঞ্চটিতে উড়ছিল পাকিস্তানি পতাকা। কিন্তু চাঁদপুর শহরে আগুনের হলকা দেখে আমরা নেমে পড়লাম একটি গ্রামে। সেখানে একটি স্কুল ঘরে প্রচুর নারী-পুরুষ। আমরা ছিলাম একটি বাড়িতে। সম্ভবত কোনো কৃষকের বাড়ি। রাতে খাবার দেয়া হলো। লোকজন আমাদের কথা এসে শুনতো। মাঝেমধ্যে কান্নার রোল স্বজন হারানোর বেদনা ও আশঙ্কা থেকে কেউ কেউ কেঁদে উঠছিল।

পরদিন প্রত্যুষে আমরা যেন একটি কাফেলার দল নদীর ধার ধরে হেঁটে যাচ্ছি। দীর্ঘ পথ হাঁটার পর একটি গহনা নৌকা পাওয়া গেল। মাঝিমাল্লারা দুপুরে আমাদেরকে ডালভাত খাওয়াল। বিকেলে একটি লঞ্চ দেখা গেল। মাঝিরা কাপড় নাড়িয়ে সে লঞ্চকে থামাল। আমরা সে লঞ্চে উঠলাম। রাতে ঐ লঞ্চটি কোনো এক ঘাটে ভিড়ল। সেখান থেকে রুটি আর সুজি কেনা হলো। পরদিন সকালে দেখা গেল ঐ সুজি নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু শুকনো রুটি খেলাম। এরপর আমরা আরেকটি লঞ্চে চড়ে বরিশাল শহরে রওনা হলাম।

বরিশাল ঘাট। লঞ্চ ভিড়ল। কিন্তু আমার মামা পা পিছলে পানিতে পড়ে গেল। উনি সাঁতার জানতেন না। লোকজন তাকে উদ্ধার করল। পানিতে ভিজে যাওয়া আমার মামাকে দেখলাম বিড়বিড় করতে। প্রিয় দুলাভাইয়ের নৃশংস মৃত্যুর পর তিনি কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন।

বরিশালের জীবন স্বাভাবিক। মানুষের মাঝে কলরব। তখনো পাকিস্তানি সৈন্যরা বরিশালে এসে নিয়ন্ত্রণ নেয়নি। মাইকে সেই সংগ্রাম গান। রাস্তার দুপাশে ঘর, দোকান, অফিসে স্বাধীন বাংলার পতাকা। যেন একটি স্বাধীন দেশে এসে আমরা পৌঁছালাম।

বরিশালে কোনো এক সহৃদয়ের বাড়িতে থেকে পরদিন আমরা ভোলার লঞ্চে উঠলাম। উথাল পাথাল নদী পাড়ি দিয়ে আমরা ভোলা খেয়াঘাটে এসে পৌঁছালাম। লঞ্চ থেকে দেখলাম ঘাটে আমাদের নানাজান দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায়। আমরা লঞ্চ থেকে নামলাম। আমার মা ও আমার নানাজানের কান্নার মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। নদীর ঘোলা পানির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। আমার ভেতরে শূন্যতা কিন্তু চোখে জল নেই। মাসহ আমার ছোট দুবোন আমার ছোট দুভাই নানাজানের আশ্রয়ে নতুন জীবন শুরু করলাম। আমার দাদাবাড়িও ভোলায় ছিল। আমার জেঠা ছিলেন কৃষক। প্রিয় ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাঠে কয়েক ঘন্টা পড়ে ছিলেন। আমার দাদীজান তার সন্তানের মৃত্যুতে অযুত ধারায় দীর্ঘ দিন ধরে বিলাপ করেছিলেন। তাঁর মতো সন্তানের জন্য কাউকে আমি কাঁদতে দেখিনি। আমার দাদাবাড়ি ভোলার ইলিশার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ছিল। নানাজানের বাড়ি থেকে মাঝে মধ্যে গ্রামে গিয়ে থাকতাম। আমাদের একটি রেডিও ছিল। তাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম। অনুষ্ঠান শোনার জন্য কয়েকজন গ্রামবাসী এসে জড়ো হত। এখনো কানে বাজে জল্লাদের দরবারের কথা। ভোলার ওয়াপদা কলোনিতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছিল। আমার নানা আত্মরক্ষার জন্য পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়েছিল। কোরআনের আয়াত লিখে দরজায় লাগানো হয়েছিল। নানার প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তাদের শূন্য উঠান খাঁ খাঁ করত। নানার আরেক প্রতিবেশী ছিল শান্তি কমিটির সদস্য।

দেশ যখন স্বাধীন হওয়ার পথে তখন আমি প্রত্যন্ত গ্রামে দাদার বাড়িতে। একদিন ধানক্ষেত থেকে দেখলাম একটি প্রজ্বলিত বিমান মাটির দিকে ছুটে আসছে। এর মধ্যে যে কবে দেশ স্বাধীন হলো তা জানি না। ভোলা শহরে এসে এক কুচকাওয়াজ দেখে নানাকে জিজ্ঞেস করাতে শুনলাম দেশ স্বাধীন। আমি অবাক হলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ কেউ আমাকে বলল না।

শহীদ মোহাম্মদ সাদেকের জেষ্ঠ্য পুত্র,
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বুলেটের আঘাতে দাদীর মৃত্যু

মোঃ আশরাফ উদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মাত্র এক বছর বয়সী শিশু। যুদ্ধের কোনকিছুই মনে করতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক বই পড়ে আর বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনে যা কিছুই জেনেছি তাতে এটা নিশ্চিত হয়েছি- যুদ্ধ ছিলো দাসত্ব, বৈষম্য, অত্যাচার থেকে মুক্তি আর অধিকার আদায়ের সশস্ত্র সংগ্রাম।

আমরা থাকতাম গ্রামের বাড়িতে। আমার দূর সম্পর্কের চারজন চাচা মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিলেন। তাঁদের তিনজনই শহীদ হয়েছেন যুদ্ধের সময়, একজন গর্বের সঙ্গে বেঁচে আছেন এখনো। স্কুল এবং কলেজ জীবনে তাঁর মুখে অনেক রোমহর্ষক অপারেশনের কথা শুনেছি, শুনেছি জীবনের মায়া ত্যাগ করে কিভাবে তাঁরা এদেশকে মুক্ত করেছেন।

রেজু মিয়া। এ নামেই পরিচিত ছিলেন আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা। স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের বাইরে দলিল লিখতেন তিনি। স্বাধীনতার ১৬ বছর পর জটিল রোগে মৃত্যুবরণ করেন। বেঁচে থাকা সেই বীর সেনানীর মুখেই শুনেছিলাম দাদীর অনাহুত মৃত্যুর কাহিনী। যুদ্ধের ডামাডোল চারদিকে। মুক্তিযুদ্ধের সে চার সেনানী এসেছিলেন রেজু মিয়ার বাড়িতে রাতের খাবার আর কয়েকঘন্টা বিশ্রামের জন্য। বিশ্রাম শেষে রাতের অন্ধকারেই তাঁরা রেজু মিয়ার বাড়ি ত্যাগ করবেন। তাঁদের একজনের হাতে ছিলো রাইফেল। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বাড়ির উৎসুক পুরুষ-মহিলারা আব্দার করলেন কিভাবে রাইফেল চালানো হয় তা দেখানোর জন্য। একজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল আনলোড করে রেজু মিয়ার দিকে নিশানা করে ট্রিগার চাপিয়ে দেখালেন কিভাবে তা চালানো হয়। রাত গভীর হল। সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। রাইফেল পাটের ব্যাগে রেখে মুক্তিযোদ্ধারা স্বল্পকালীন বিশ্রামে গেলেন।

এদিকে রাইফেল চালনা প্রদর্শনের সময় দাদী (রেজু মিয়ার পত্নী) ছিলেন পাশের বাড়িতে। বাড়ি ফিরে উৎসুক হলেন রাইফেল চালানোর কৌশল দেখতে। তিনি রেজু মিয়াকে অনুরোধ করলেন একবার তা দেখাতে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমিয়ে আছে। রেজু মিয়া পাটের ব্যাগ থেকে রাইফেল বের করে নিশানা করলেন দাদীর বুকের দিকে। ট্রিগারে চাপ দিলেন। বুলেট মুহূর্তেই দাদীর বুক চিরে ফেলল। দাদী লুটিয়ে পড়লেন। যোদ্ধারাসহ। বাড়ির অন্যরাও জেগে উঠলো। রেজু মিয়া বুঝতে পারলেন ঘুমাবার আগে রাইফেলটি লোড করে রেখেছিলো যোদ্ধারা। অনুশোচনা করলেন অনেক। দাদী কোনোদিন আর ফিরে আসলেন না।

চীফ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার
আমেরিকান ঈগল ট্যাংকারস

কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ

মোঃ আলমগীর লাবু

মুক্তিযুদ্ধের অল্প কয়েক বছর পরে আমার জন্ম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আমার হৃদয়ে বিশাল আসন গেড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার আক্ষেপ আমার। তেমনিভাবে যুদ্ধে সাহসী যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা শুনে গর্বে বুক ভরে যায়। ভাবতে ভালোই লাগে, আমরা তাদেরই প্রজন্ম।

মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি প্রথম মার মুখ থেকে। তার মুখ থেকেই শুনি এ দেশের মানুষের সবারই চাওয়া ছিল দেশ পাকহানাদার থেকে মুক্তি পাক। আজকে আমার এই গল্পটা আমার মার মুখ থেকে শোনা। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো বীর যোদ্ধা নয়, বরং এ দেশের অতি সাধারণ মানুষদের কথা। একটি সাধারণ গ্রামের কথা। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দেশের বিপদগ্রস্ত মানুষদের দিকে। তার বিপরীতে দেখতে পাই আরো কিছু অকৃতজ্ঞ মানুষদের। যারা অন্য দেশ থেকে এ দেশে এসে 'বিহারী' নাম ধারণ করে এবং যুদ্ধের সময় তাদের আশ্রয়দাতা দেশের মানুষদের ওপর অত্যাচার করেছে পাক বাহিনীর মতো।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে আমার মা ছিলেন ঢাকার কাঁঠাল বাগানে। নানাবাড়ি ছিল মোহাম্মদপুরে। পাশে বসবাস করতো বিহারীরা। এমনই প্রতিবেশী বিহারী লোকদের আমার নানা নানারকমভাবে সাহায্য করেছেন। তাদের কয়েকজনকে বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে নিয়োগও দেন। তখন মোহাম্মদপুর ছিল পুকুর, ডোবা ও ধানের জমিতে পূর্ণ।

যুদ্ধের শুরু হতে আমার মা কাঁঠাল বাগানে আটকা পড়েন। কার্ফ্যু শেষ হতে তিনি অনেক কষ্টে মোহাম্মদপুর আসতে চান। কিন্তু লোক মারফত খবর পান নানারা সপরিবারে বুড়িগঙ্গার অপর পারে কেরানীগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছেন। আর ঘরের সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে প্রতিবেশী বিহারীরা। বিশেষ করে যাদের আশ্রয় দিয়েছিল তারাই বিপদে সুযোগ নিয়ে সব হাতিয়ে নিয়েছে। জ্বালিয়ে দেয় নানার বড় বসতঘর।

আমার মা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় নানাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তখন মোহাম্মদপুরের বেশির ভাগ লোক কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। কেরানীগঞ্জবাসীর অবদান মুক্তিযুদ্ধে কোনো অংশে কম নয়। তারা নিজের ঘর বিপদগ্রস্ত মানুষদের জন্য ছেড়ে দেয়। নিজের খাবার তাদের জন্য ব্যয় করে। তারা কোনো কিছু পাবার নিমিত্তে নয়, বরং দেশের মানুষদের বিপদে ভাই হিসেবে এগিয়ে এসেছে।

দেশের অন্য সব যুবকের মতো মোহাম্মদপুরের কিছু সাহসী যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়। প্রশিক্ষণের জন্য আগরতলায় যাবার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে তারা কেরানীগঞ্জ থেকে নৌপথে ঢাকা হয়ে আগরতলায় যাবার পরিকল্পনা করে। দলে ছিল জয়নাল, বাবুল, বশির, নাজিম উদ্দিনসহ অন্যরা।

ঢাকা পৌঁছাতে রাত হয়ে যাওয়ায় কার্ফ্যুর মধ্যে বাবুলের এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নেয়। বন্ধুর বউটি ছিল বিহারী। তার দেয়া খবর মতে ভোর রাতে তারা আর্মির হাতে গ্রেপ্তার হন। সঙ্গে বন্ধুটিও। যুদ্ধে যাওয়া হলো না সে যুবকের। অকৃতজ্ঞ বন্ধু স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় তারা অকালেই শহীদ হন।

অথচ মুক্তিযুদ্ধের পরেই সে মেয়ে লোকটি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তাকে অনেকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মুরুব্বিরা তাকে রক্ষা করেন। আজো সে বহাল তবিয়তে টিকে আছে এই দেশে। আমরা এতই কৃতজ্ঞ।

মোহাম্মদপুরের জয়েন্ট স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত সরকারি কর্মচারীরা। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অন্য জায়গায় বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হলেও, মোহাম্মদপুরে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় যুদ্ধের পর পর। রায়ের বাজারের কসাইখানায় অর্ধেক লোক এই স্টাফ কোয়ার্টারের বাসিন্দা। পাক হানাদারের চেয়ে ঘৃণিত এই বিহারীরা বাঙালি নারীদেরও ছাড়েনি।

যুদ্ধের সময়ই তারা দখল করে নেয় এ সব স্টাফ কোয়ার্টার। আজো তাদের দখলে আছে এই বিল্ডিংগুলো। এখানে নির্যাতন কেন্দ্র বানিয়ে অনেকের জীবন, অনেক নারীর সম্মান হরণ করা হয়।

যুদ্ধের পরে অনেককে ধরে হত্যা করলেও বেশিরভাগ বিহারী রেহাই পায় বাঙালিদের মহানুভবতায়। আজো তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কাটলে আমরা প্রতিবাদী হই। অথচ এই অকৃতজ্ঞগুলো এখনো ক্যাম্পে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে বেড়ায়।

বুড়ি সমীর মার বয়স ছিল ৬৪ বছর। যুদ্ধ শুরু হলে সবাই মোহাম্মদপুর থেকে পালালেও বুড়ি সমীর মা থেকে যায়। তাছাড়া বুড়ি হওয়ায় এবং দুধ বিক্রি করায় বিহারীরা তাকে কিছু বলেনি। তবে যুদ্ধের সময় অনেক বিহারী তাকে বিনা পয়সায় দুধ দিতে বাধ্য করত। না হলে তার গাভী ছিনিয়ে নেবার ভয় দেখাত।

বুড়ি যুদ্ধের সময় তার বাসায় গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিত। তাদের হাতে তার জমানো টাকা দিত। পাকবাহিনীর খবরাখবর সে সাপ্লাই করতো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। আর বিহারী পরিবেষ্টিত এলাকা বলে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নিরাপদ। বুড়ি তাদের বলত, 'বাবা হারামির বাচ্চাগুলারে তাড়াতাড়ি এই দেশ থেইক্যা তাড়াইতে হইব।'

কিন্তু বিধিবাম। কোন উৎস হতে খবর চাউর হয় বুড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে। ফলে একদিন সকালে বুড়ি ও বুড়ির গাভী দুটি জবাই অবস্থায় ঘরের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর বুড়ির জোয়ান মেয়েটি নিরুদ্দেশ। কিছুক্ষণ পরে শুধু বুড়ি পড়ে থাকে, গাভী দুটি মাংস হয়ে লুট হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশ স্বাধীন হলে আমার নানারা আবার মোহাম্মদপুর ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে পায় না আগের অবস্থা। মুক্তিযুদ্ধে অনেকের মতো তারাও কিছু হারায়। কিন্তু আমার মা, নানারা এই বিপদের মধ্যে যে গ্রামবাসীর সেবা পেয়েছিল তা অতুলনীয়। আমরা তাদের স্মরণ করি আজও। সঙ্গে সেই অজানা বুড়ি, শহীদ বাবুল, জয়নাল ও অসংখ্য বুদ্ধিজীবীদের। যাঁরা এই দেশের চরম অকৃতজ্ঞ বিহারীদের হাতে শহীদ হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে নৃশংসতায় শুধু পাক হানাদার, রাজাকার, আলবদররা নয়, বরং বিহারীরাও ছিল তাদের সমপর্যায়ের। প্রত্যক্ষদর্শী আমার মা এবং অন্যদের মুখ থেকে শুনেই তাদের আসল চরিত্র সম্পর্কে জানালাম। যা অনেকটা অপ্রকাশিত ছিল।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মোহাম্মদপুরের জয়েন্ট স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত সরকারি কর্মচারীরা। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অন্য জায়গায় বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হলেও, মোহাম্মদপুরে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় যুদ্ধের পর পর। রায়ের বাজারের কসাইখানায় অর্ধেক লোক এই স্টাফ কোয়ার্টারের বাসিন্দা। পাক হানাদারের চেয়ে ঘৃণিত এই বিহারীরা বাঙালি নারীদেরও ছাড়েনি

মুক্তিযোদ্ধা সাহেব মিঞা

কামরুল আনোয়ার চৌধুরী

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া থানার অন্তর্গত মরিয়মনগর গ্রামের ফুলগাজীপাড়ার অধিবাসী সাহেব মিঞা। পেশায় তিনি ব্যবসায়ী। ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে রাঙ্গামাটির লংগদুতে ব্যবসা করতে এসে ক্রমাগত একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে স্থানীয় বাঙালি ও উপজাতি সমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এ অঞ্চলের সবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে এখানকার বাঙালি ও উপজাতিদের যেকোনো পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যায় তাঁর বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। এখনো এ অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। কিন্তু তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অগাধ ভান্ডার। শৈশব থেকে পত্র-পত্রিকা, বইপত্র পড়ার অভ্যাস। প্রবল তার জ্ঞান ও স্মরণশক্তি। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা ও বিশ্লেষণে তার জ্ঞান ও দক্ষতা শীর্ষ পর্যায়ে। উঁচু মানের গবেষকদের মতো। কিছুদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কমরেড আবদুছ ছাত্তার, ফনী বড়ুয়া, দেবেন সিকদার প্রমুখের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন। তার আছে অফুরন্ত কর্মশক্তি ও উদ্ভাবনী মন। একবার কাঠ দিয়ে নদীর জল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র তৈরি করে সবার কাছে বৈজ্ঞানিক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ বাঙালি জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন। পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে মনস্থির করেন। পাকবাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংসতায় অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালি গ্রামের দিকে পলায়ন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও আরআই চৌধুরী অনেক লোকজনসহ তার গ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন। তাদের তিনি যথেষ্ট যত্নআত্তি করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল তার সরাসরি যোগাযোগ। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি খাবার-দাবার বা রসদ সামগ্রী, ওষুধপত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, রণনীতি, রণকৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, জনযুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তার ব্যাপক পড়াশোনা থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক সমস্ত কাজ তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্টের দিকে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি নিজ বাড়ি থেকে রাঙ্গামাটির লংগদু গমন করেন। সেখান থেকে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দেমাগ্রী নামক স্থানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান পুয়াংখাই ক্যাম্পে যান। এ ক্যাম্পে সরাসরি যুদ্ধের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ক্যাম্পে অবস্থানরত পটিয়ার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন রহমানীর মাধ্যমে তার পরিচয় হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল কে বি যোশীর সঙ্গে। ফৌজ ২২২। মি. যোশী সাহেব মিঞার দক্ষতা, বিচক্ষণতা, ক্ষিপ্রতা ও কর্মপ্রাণ মন দেখে খুবই মুগ্ধ হন। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সাহেব মিঞাকে রাঙ্গামাটির লংগদু থানার রাঙ্গীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাঙ্গীপাড়া সেক্টরে এফএফ ফোর্সের (F.F Force) সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তখন নবেম্বরের শেষ দিক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেকে সহযোদ্ধা হিসেবে তখনকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রাজপুত ব্যাটালিয়নের সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন খান্না। মি. খান্নার নেতৃত্বে সাহেব মিঞা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রণপ্রস্তুতি ও রণকৌশলগত তার বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে ভারতীয় বাহিনীর সেনা অফিসাররা অবাক হয়ে যান। সেখানে আরো ছিলেন ক্যাপ্টেন সাদী, বিএসটি থাপ্পাসহ তিব্বতি বংশোদ্ভূত প্রচুর ভারতীয় সেনা। সাহেব মিঞা ভালো উর্দু জানার কারণে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে তাকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। তারা সাহেব মিঞাকে 'মিঞা সাহাব' নামে সম্বোধন করতেন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর রাঙ্গীপাড়া এলাকার খাগরইরগা নামক স্থানে পাকবাহিনীর অবস্থানকারী সৈন্য ও তাদের মিত্র ভারতের মিজোরামের মিজো বিদ্রোহীদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি। ৮ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী রাঙ্গীপাড়া ফরেস্ট অফিস আক্রমণ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিল ১৪ ডিসেম্বর। এ দিন মুক্তিযোদ্ধারা প্রচন্ড আক্রমণ করে পাকসেনাদের হটিয়ে মাইনীবাজার দখল করে। এ দিন সাহেব মিঞা সহমুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দুজন ভারতীয় ক্যাপ্টেন ও ২৬ জন তিব্বতি সৈনিক নিয়ে মাইনী অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে কাপ্তাই লেকের পানি এসে রাস্তা ডুবে যাওয়ায় নৌকায় করে লক্ষ্যস্থলের দিকে গমন করেন। নৌকায় কিছু সৈন্য রেখে লোহাখাটবাগান নামের এক টিলায় উঠে পাকসেনাদের ঘাঁটি বরাবর দুটি মর্টার থেকে ৬ রাউন্ড ৬ রাউন্ড করে ১২ রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করেন। বিপরীত দিক থেকেও গোলাগুলি চলে। দীর্ঘক্ষণ উভয় দিক থেকে গোলাবর্ষণের পর শত্রুবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। মাইনীবাজারেও মুক্তিবাহিনীর বিজয় পতাকা ওড়ে। সবাই মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে আনন্দ-কোলাহালে অভিনন্দিত করে। প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন যোশীসহ বর্ণিত ভারতীয় সেনা অফিসার সবাই এ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন প্রচুর তিব্বতি সৈন্যও। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রাহমানীসহ তাদের চেনা-অচেনা মুক্তিযোদ্ধারা এতে অংশ নেন। যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সেনা অফিসাররা সাহেব মিঞাকে বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর এসব অফিসার যুদ্ধের পর ভারত গেলেও দীর্ঘদিন সাহেব মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। সাহেব মিঞা সরকার থেকে ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর গ্রামে কারা গুজব ছড়ায়, মুক্তিযোদ্ধাদের নিধন করা হবে। এ ভয়ে তার স্ত্রী সনদপত্রটি পুড়ে ফেলেন। অনুসন্ধান সাপেক্ষে এই মহান মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র লাভ ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। তিনি এখন তার গ্রামে বসবাস করছেন।

গ্লোরিয়া (কাপরের দোকান)
৩৪ বিপণী বিতান (নীচতলা)
চট্টগ্রাম

‘পাঠ্য’ ‘অপাঠ্য’ ১৯৭১ ও মাছকাটা বটি

টোকন ঠাকুর

ঘটনার লিখিত রূপ দিতে পারা একটি যোগ্যতা। সত্যতা, তাগিদ, মূল্যায়ন, যোগ্যতা ইত্যাদি মিলিয়ে ঘটনার ঐতিহাসিকতা দাঁড়াতে পারে; কিন্তু আমাদের জীবনে তা এখনো যেমন দাঁড়াচ্ছে না আর ১৯৭১ সালের প্রেক্ষিতে, এই বাংলায়, তাও আবার জলমগ্ন পাড়াগাঁর কোনো ঘটনা- না, লিখিত হয়ে ওঠেনি, লিখিত হয়ে ওঠে না।

তাই লিখিত যুদ্ধ-ইতিহাসের চেয়ে অলিখিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেক বেশি তথ্য-বিস্তৃত, জীবনমৃত্যুর গল্পগাথায় রোমহর্ষক, আবেগময়, সাহসী বা অনেক বেশি টালমাটাল। এ দেশে ‘পাঠ্য’ যতটা মানুষের মুখে মুখে ফেরে, ‘অপাঠ্য’ অনেক বেশি। কজনেরই বা ১৯৭১ সালের বাস্তবতা পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে অভিজ্ঞান লেখার মতোন মানসিক গঠন বা পরিপক্বতা ছিল? ক’জনইবা লিখতে পারেন? ক’জনইবা লিখেছেন আত্মমুখী-দিগ্বলয়ের আদ্যেপান্ত ছাড়াও অপরাপরদের আত্মত্যাগ-বলিদান? প্রশ্নও থাকে, কীভাবে লিখবেন? একটি আদিগন্ত গ্রামকেন্দ্রিক, নিরক্ষরপ্রধান দেশের মানুষের স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লেখা হয়ে ওঠা দুঃসাধ্যও বটে। উপযুক্ত দায়িত্ববোধ না জন্মালে তা সম্ভবও নয়।

আমি নিশ্চিত, এক সেই সাহসী মহিলার কথা এখনো কোনো টেক্সটে পাইনি। তার সাহসী আত্মদান সম্ভবত কোথাও লেখা হয়নি। মুখে মুখে ফেরা বাংলাদেশ অলিখিতই থেকে গেল। থেকে যাবে! না হলে যে দেশের মাটিতে পোঁতা নাড়ির ফুল, সেই দেশ আজ ভয়ঙ্কর প্রশ্নবিদ্ধ- ‘আমরা কী এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম?’

আ.

কেউ একজন সেই গোয়েন্দা, তিনি বললেন- রাতেই কুষ্টিয়া থেকে কয়েকটি পাকিস্তানি আর্মির লরি ফিরে যাবে ঝিনাইদহ হয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টে। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কে বড়দহ বাজার ও গাড়াগঞ্জ বাজারের মধ্যে কুমার নদের ওপরে বড়দহ ব্রিজ। বেশ বড়। স্থানীয় মধুপুর, বারোইপাড়া, গাড়াখোলার চর, আনিপুর, বড়দহ, বাজুখালী, রানীনগর, শ্রীরামপুর, বসন্তপুরসহ এলাকার তরুণ-যুবারা, যাদের হাতে তেমন অস্ত্র ছিল না, তারা সিদ্ধান্ত নিল, একটা কিছু করতে হবে। লরিগুলো কুষ্টিয়া থেকে মাঝরাতের পর ফিরে যাবে ঝিনেদা হয়ে যশোরের দিকে। লরির মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্য, তাদের কাছে প্রচুর গোলাবারুদ। গ্রামাঞ্চলের তরুণ-যুবারা বিকেলের মধ্যেই কিছু সাধারণ বন্দুক ও কিছু গুলি জোগাড় করে ফেলল। প্রতিরোধ করতেই হবে। কারো মাথায় একটা বুদ্ধিও খেলে গেল। বুদ্ধি মোতবেক, কুমার নদের ওপরে ব্রিজের দক্ষিণ দিকের অংশ ভাঙতে শুরু করল নাম না জানা ডজন ডজন বাঙালি তরুণ-যুবা। ২/৩টি লরি পরপর দাঁড় করালে যতটুকু জায়গা, ব্রিজের ঝিনেদার দিকের অংশ ততটুকু ভেঙে ফেলা হলো সন্ধ্যার মধ্যেই। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? দেশপ্রেম কাকে বলে?

তারপর, বাঁশের চাটাইয়ে আলকাতরা মাখিয়ে কালো করে ব্রিজের ভাঙা অংশে, পিচঢালাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো। চাটাইয়ের নিচে দু-একটা বাঁশ মাটিতে পুঁতে চাটাইকে ঠেকনা দিয়ে রাখা হলো কোনো রকমে। ব্রিজের উত্তর দিকে অর্থাৎ কুষ্টিয়া থেকে যখন লরিগুলো ব্রিজের ওপরে চলে আসবে, রাতের কারণে ব্রিজের ভাঙা অংশের শূন্যতায় আলকাতরা মাখানো চাটাইকেও ব্রিজের রাস্তার অংশই মনে হবে।

যে যার জায়গায় মতো পজিশন নিয়ে বসে আছে সেই স্থানীয় নামহীন মুক্তিযোদ্ধা দল। রাত আস্তে আস্তে বাড়ছে। রাতের অন্ধকারে শত্রুর অপেক্ষায় বসে আছে কোনো রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই কিছু বাংলা মায়ের সন্তান। তারা জানে, দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়, রাতের নৈঃশব্দ চিরে দূর থেকে লরি আসার শব্দ শোনা গেল। দূর থেকে চোখে পড়ছে হেড লাইটের আলো। সচকিত হলো ব্রিজ ভেঙে ওঁৎ পেতে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধা দলটি।

গাড়ি ব্রিজে উঠে এলো। লরিগুলো খুব গায়ে গা লাগিয়ে ছুটে আসছে। চূড়ান্ত প্রস্তুতির শেষ, মুক্তিযোদ্ধা দলের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠছে। সাব্বাস!!

কালো চাটাইয়ের ওপরে যেতে যেতেই পরপর দুটি লরি পড়ে গেল। তৃতীয়টা ছিল জিপ। সেটাও থামতে থামতে গিয়ে পড়ল। নদীর মধ্যে পড়ে গেল সৈন্যভর্তি তিনটা গাড়ি। বাকি গাড়িটা ব্রিজে ওঠার আগেই সামনেরগুলোর পরিণতি দেখে থমকে দাঁড়াল এবং ব্রিজের ওপর থেকে পিছিয়ে গেল। তারপরই শুরু হলো গুলির উৎসব। নদীর মধ্যে পড়ে যাওয়া গাড়িগুলোর সৈন্যরা ক্ষতবিক্ষত, কিছুক্ষণ পরই তারা সামলে উঠল। আর ওপরের রাস্তায় থাকা গাড়ির সৈন্যরা- সবাই হতবিহ্বল হয়ে রাতের অন্ধকারে আগুনের ফুলকি ঝরিয়ে দিল। দিগ্বিদিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি করতে করতে গাড়াখোলা, বড়দহ, রানীনগরের গেরস্থালি-রেখায় আক্রমণ করে চলল। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারাও যতটা সম্ভব পাল্টা আক্রমণ করে চলল। সারারাত খুব গোলাগুলি হলো। স্থানীয় গ্রামগুলোর গোয়ালে অনেক গরু মারা পড়ল। মানুষ অবশ্য দূরে নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছিল আগেই। সবাই জানত, রাতে বড়দহ ব্রিজে যুদ্ধ হবে। কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ হয়েছিল।

সকালের আলো ফুটতেই দেখা গেল ব্রিজের কাছাকাছি বেশকিছু সৈন্য মরে পড়ে আছে। অনেক সৈন্য রক্তাক্ত, আহত। অনেকেই রাতের অন্ধকারে কোনদিকে গেছে কেউ বলতে পারছে না। আসলে ব্রিজের ধোঁকা খেয়ে লরিভর্তি সৈন্যরা নদীতে পড়ে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। ভোর থেকে স্থানীয় গ্রামবাসী ও তরুণ-যুবারা পাকিস্তানি সৈন্যদের নাজেহাল দশার কথা এলাকায় ছড়িয়ে দিল। নাকি দশা নিজেই ছড়িয়ে পড়ল? অনেক অক্ষত সৈন্য তখনো ব্রিজের ওপরে-নিচে, পাশেই ছিল এবং তারা ছিল ভীত, ক্রুদ্ধ এবং দিশেহারা। তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছিল। দু-একবার গ্রামবাসীর দিকেও তারা টার্গেট করছিল। রাতের যুদ্ধেও দুপক্ষেই যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে ভড়কে যাওয়া পাকিস্তানি অক্ষত সৈন্যরাও। উদ্ধার করতে আসা দুটো হেলিকপ্টার অনেক ওপর থেকে ছোঁ মেরে নিচে নামতে নামতেও আর নামল না। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছিল হেলিকপ্টার। দিন গেল। কিছু সৈন্য ব্রিজের কাছে জড় হয়ে আছে। কিছু সৈন্য আহত-নিহত। কিছু আক্রমণের রাতেই দিগভ্রান্ত হয়ে এদিক- সেদিন চলে গেছে।

দ্বিতীয় রাতে, জড় হয়ে থাকা সৈন্যদের ওপর নদীর ওপার থেকে আক্রমণ করা হলো। সৈন্যরাও পাল্টা জবাব দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, ব্রিজের কাছে নিহত সৈন্যের সংখ্যা বেড়েছে। ওদিকে দিগভ্রান্ত সৈন্যদের একটি দল ভয়ে দিশেহারা হয়ে কয়েক মাইল দূরে মাইলমারি গ্রামের এক আখক্ষেতে আশ্রয় নিল। পথে তারা গুলি করে মেরেছে প্রতিহত করতে সামনে চলে আসা কয়েকজন তরুণ-বালক মুক্তিযোদ্ধাকে। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর, মনোবল হারানো সেই ছয়জনের সৈন্য দলটি কি করবে, কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। দিনের বেলায় গ্রামে কোনো পুরুষ লোক থাকত না, বিশেষ করে তরুণ-যুবারা। রাতে তারা গেরিলা আক্রমণ করত। সন্ধ্যায়, সৈন্য দল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মাইলমারি গ্রামের একটি গেরস্থ বাড়িতে গিয়ে উর্দু-বাংলা মিলিয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। অনেকক্ষণ পর একজন মাঝবয়সী মহিলা মাথার ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন এবং ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর সৈন্যরা তার কাছে খাবার-দাবার চাইল। মহিলা সৈন্যদের জানান, মুড়ি আছে, সেটা তারা খাবে কি না?

খুশি হলো সৈন্যরা। মহিলা তাদের জন্য বড় এক গামলা মুড়ি এনে দিলেন। ক্ষুধার্ত সৈন্যরা গোগ্রাসে সব মুড়ি খেয়ে ফেলল। মুড়ি খাওয়ার পর পানির পিপাসা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। সৈন্যরা পানি খেতে চাইল। মহিলা বললেন, 'আমার মাটির কলসিটা ভেঙে গেছে। তাই আপনারা আমাদের কুয়া থেকে পানি তুলে নিজেরাই খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। কুয়াটি বাড়ির ভেতরে। তবে সবাই একসঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকলে আমার অসুস্থ শ্বশুর আপনাদের দেখে ভয় পেয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই একজন একজন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কুয়ার দিকে গিয়ে পানি খেয়ে এলেই ভালো হয়।' মহিলা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

একে তো পিপাসার্ত, তার ওপরে যে আগে গেল সে আসছে না দেখে কিংবা তার দেরি হওয়ায় দ্বিতীয় সৈন্যটিও বাড়ির ভেতরে গেল। তারপর গেল তৃতীয় জন। চতুর্থজন সম্ভবত দলটির প্রধান। কড়া সতর্কতার সঙ্গে আঁচ করে উঠতে পারল- এই মহিলা 'অবলা বাঙালি' নারী নন, অন্য কিছু। সে সঙ্গের দু'জনকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কুয়োতলার দিকে গিয়ে দ্যাখে, তাদের তিনজন সৈন্যেরই গলাকাটা। একটু দূরে দূরে তারা পড়ে আছে। গলার কাটা অংশ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। রক্তের সঙ্গে একটু আগের চিবানো মুড়ি বেরিয়ে আসছে। আমাদের গোটা মুক্তিযুদ্ধের এক বিরল দৃশ্য। পাশেই, রান্নাঘরের মধ্যে সেই মহিলা, সচকিত, তার হাতে রক্তাক্ত বটি, বড় মাছ কাটার বটি। মহিলার চোখে-মুখে ক্রোধ। প্রতিরোধের অঙ্গীকার।

মুহূর্তেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল সেই তিনজন সৈন্য হত্যাকারী মহিলার সারা শরীর। বাড়ির মধ্যে আর কেউ না থাকায় দলপ্রধান সৈন্যটি উদ্ভ্রান্ত হয়ে বাকি দুজনকে গুলি করল পরপর। গুলির শব্দে বাঁশবাগানের অপ্রতিরোধ্য শব্দমালার কিচিরমিচির বাঙালি সন্ধ্যায়, পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মগ্লানিমাখা দলনেতা নিজের মাথায় নিজেই তাক করল নিজের পিস্তল। সেদিনের শৈলকূপা থানার অজপাড়াগাঁও মাইলমারির একটি বাড়িতে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। ৬ জন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে গ্রামবাসী গণকবর দিল। সসম্মানে সেই মহিলার আলাদা কবর হলো। ত্রিবেণী, রামচন্দ্রপুর, পিয়ারপুর, বাঘআঁচড়া, জোড়াদহ ভায়না পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এই ঘটনার কথা। হাজার হাজার মুখে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার মতোই মাইলমারির ঘটনা মুখে মুখে নিরুদ্দেশে গেল। লিখিত হলো না।

খুব সম্ভবত আমার বাবাকে আমি 'আবা' বলে ডাকতাম।

ছোটবেলায়, মামাবাড়িতে যাওয়ার সময় দু-একবার মাইলমারি গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া মেঠো রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে, কখনো 'আবা'র সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ারে বসে যেতে যেতে, মাইলমারির ঘটনাটা 'আবা'র মুখেই শুনেছি এবং আমার 'আবা'ও সেই তরুণ-যুবাদের একজন, যারা ব্রিজ ভেঙে, আলকাতরা মাখানো চাটাইয়ের লরিফেলা ফাঁদ পেতেছিল। পাক সৈন্য ধরার ফাঁদ। জীবনবাজি রাখা ফাঁদ।

মাইলমারি গ্রামের কোন বাড়িটা সেই মহিলার বাড়ি? সেই মহিলার নাম কি? না, আমি তা জানি না। সেই ছোটবেলাও যথারীতি হারিয়ে ফেলেছি। অনেক বছর পর, আবার মুখে শোনা সেই বড়দহ ব্রিজ ভাঙা ও মাইলমারির বীরাঙ্গনা মহিলার কথা মনে পড়ছে। এতদসংক্রান্ত লিখিত রূপ পেয়েছি শুধু একটি অর্ধবাক্য। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি'র 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থের একটি জায়গায় 'বড়দহ ব্রিজ ভেঙে সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, প্রচুর হতাহত হয়েছিল' শুধু এটুকুই লিখিত 'পাঠ্য', বাকিটা আমার 'আবা'র মুখে শোনা, 'অপাঠ্য'।

আমরা যারা রূপকথা শোনার বয়সে শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের গল্প, আমার বিশ্বাস তারা প্রায় সবাই বড় হতে হতে শুনেছে এমন অনেক যুদ্ধ দিনের গল্প বা মৌখিক ইতিহাস, যা এখনো 'পাঠ্য' হয়ে ওঠেনি। 'অপাঠ্য' সেই মুখে মুখে ফেরা খণ্ডদলিল, যা এই জাতিসত্তার তুমুল অহঙ্কার, নিশ্চিত তা মুখে মুখেই হারিয়ে যাবে, আমাদের সোনালি রোদের দিনগুলোর মতো!

২২৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

দুঃস্বপ্নের রাত

হাফিজুর রহমান

আমি নিজে কোনো মুক্তিযোদ্ধা না। না কোনো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; এখন অন্তত তাই। কারণ কাগজে কলমে আমার বাবার নাম মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নেই। সেটা অবশ্য আমার বাবার গাফিলতির জন্যই। আব্বা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তখন মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেননি। হয়তো ভেবেছিলেন, কী হবে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়ে। নেক্সট টাইমে যে এটা কাজে লাগবে, অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে, তা তিনি ধারণাই করেননি। অথচ তিনিও মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। ক্যাম্পে ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম এমপি বকুল, শহীদ বুলবুল, রবিসহ আরো অনেকেই ছিলেন তার বন্ধু। তাদের সঙ্গে ছিলেন আব্বা। সে যাক, যা হবার হয়েছে। এখন আর এসব বলে লাভ কী।

আমাদের দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সকল বীর বাঙালি ফাইট করেছে, যারা দেশের জন্য নিজের প্রাণের কথা না ভেবে শুধুমাত্র পেট্রিয়টিজমের কথা চিন্তা করে অকাতরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে সামান্যতম কার্পণ্য করেননি, তাদরে কথা কম-বেশি সকলেই জানে। আমদের এ সকল মহান ফ্রিডম ফাইটার্সদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ। যাদের কথা, যাদের অবদানের কথা এদেশ, এ জাতি কখনো ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

৭১, সেই রক্তাক্ত ৭১-এ কত ঘটনাই না ঘটে গেছে আমাদের প্রাণের দেশ বাংলাদেশে। পাক হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের রাতে নিরীহ নিরপরাধ ঘুমন্ত বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে বর্বর নির্যাতন শুরু করেছিল, হাজার হাজার বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তা কারও অজানা নয়। অজানা নয় নিরীহ মানুষের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর ঘটনাও। নির্বিচারে কত মানুষই না হত্যা করেছে তারা। অবুঝ দুধের শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করতে পর্যন্ত হাত কাঁপেনি তাদের, হৃদয়ে এতটুকু নাড়া দেয়নি। খুন, ধর্ষণ, রাহজানি, ছিনতাইসহ আরো অনেক নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়, বাঙালি জাতির কাছে। সাক্ষী হয়ে আছে পাক-বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের।

এ রকমই এক নির্যাতনের, হত্যাযজ্ঞের ঘটনা তুলে ধরব আজ সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্মানিত পাঠকদের জন্য। যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি, ঘটনাটা আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের মুখে শোনা।

পাক হানাদার বাহিনী সুজানগরে ক্যাম্প করেছে শুনে অধিকাংশ লোক পালিয়ে গেলেও থেকেও গেল অনেকেই। তারা ভাবল, সবে মাত্র আজ ক্যাম্প করেছে যেহেতু পাক সেনারা, অভিযান চালাতে হয়তো দু' একদিন দেরি হবে। কিন্তু কে জানত, সেদিন রাতেই নিরীহ নিরপরাধ মানুষের ওপর আক্রমণ চালাবে রক্তপিপাসু পাক সেনারা। সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে যার যার ঘরে। গরম পড়ছে, ঘরের বাইরে উঠোনে পাটি বিছিয়েও শুয়ে আছে অনেকে। কেউ বা আবার ধান মাড়াই করার চরাটের ওপর।

সকলেই গভীর ঘুমে অচেতন। যেন পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে তারা। কিন্তু তারা কী জানে, একটু পর কী ঘটতে যাচ্ছে তাদের ওপর, চির নিদ্রায় শায়িত হতে যাচ্ছে তারা? না তারা তা

জানত না। তবে জানল খানিকক্ষণ পরই। হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধ নীরবতা চিরে ফালাফালা করে দিল বিকট গুলর শব্দ। এবং তার পরপরই শোনা গেল বুকফাটা আর্তচিৎকার। পাক বাহিনী হত্যা করেছে একজনকে। এরপর যেন আর কোনো থামাথামি নেই। অনবরত স্টার্ট হয়েছে গুলিবর্ষণ। যেন চারদিকে গুলির ঝড় শুরু হয়েছে। একটু আগের সেই শান্ত পরিবেশ আর শান্ত নেই, শুরু হয়েছে আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি। গুলি খাওয়া মানুষের আর্তনাদে যেন রাতের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। নিষ্ঠুর পাক সেনারা একের পর এক হত্যা করে চল নিরীহ মানুষ। এমন কি খড়ের গাদার নিচে লুকিয়েও পার পেল না অনেকে। অবাধে মানুষ হত্যা করে চলল পাক সেনারা। যেন মানুষ হত্যার নেশায় পেয়ে বসেছে ওদের।

ঘন্টাখানেকের এই অমানবিক হত্যাযজ্ঞে খুন করল একশ'য়ের ও বেশি মানুষ। এরপর যখন তারা মনে করল আর কেউ বেঁচে নেই, ক্ষান্ত দিল বুলেট ছোঁড়ায়। লাশ ডিঙিয়ে, লাশের উপর পারা দিয়ে খুশি মনে ফিরে গেল নরপিশাচগুলো।

পাকবাহিনী চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল লুকিয়ে থেকে কোনো রকমে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো। মুরুব্বি লোকটি সব লাশগুলো তার উঠানে জমা করার নির্দেশ দিল। শুরু হলো লাশ তালাশ করা। দেখা গেল, কেউ মরে পড়ে আছে পুকুর পাড়ে, কেউ মাচার নিচে, কেউ খড়ের গাদায়, কেউ বা আবার বাঁশঝাড়ের ভেতর। স্যারের চাচাত ভাইকে দেখা গেল দুই হাতে দু'টো বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবেই গুলি লেগে মারা গেছে সে। সব লাশ এসে জমা করা হলো উঠানে। মোট প্রায় ১১৪ জন (সংখ্যাটা সঠিক মনে নেই, এ জন্য প্রায় লিখলাম)। দেখা গেল উপস্থিত সকলেরই কেউ না কেউ মারা গেছে। কারো বাপ, কারো মা, কারো স্বামী, কারো স্ত্রী, কারো সন্তান ইত্যাদি। কারো চোখেই জল নাই। সবাই যেন শোকে পাথর হয়ে গেছে। পৃথক পৃথক ভাবে এত কবর কাটা এখন সম্ভব না। তাই ডিসিশন হলো, গোরস্থানের লম্বালম্বি ঢালাওভাবে কবর দেয়া হবে। তাই করা হলো। পাশাপাশি শুইয়ে দেয়া হলো ১১৪ জনের লাশ। সেদিন ঐ গ্রামের ঐ সকল লোকদের ওপর যেন নেমে এসেছিল কোনোও ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাত।

এই শেষ নয়, এ রকম আরো কত দুঃস্বপ্নের রাত আঘাত হেনেছে নিরপরাধ বাঙালি জতির ওপর তার ইয়ত্তা নেই। নির্দয় পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতা এরকম আরো অনেক ঘটনাকেও হার মানিয়েছে। কত ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কত মানুষকে ঝাঁঝরা করেছে। কিন্তু তবুও কি তারা রুখতে পেরেছে বাংলার স্বাধীনতাকে? তাদের কালো থাবায় জিম্মি করে রাখতে পেরেছে বাঙালি জাতিকে? সাকসেস করতে পেরেছে তাদের মহা ষড়যন্ত্র? নো, নেভার এন্ড সারটেইনলি নট। আমরা ঠিকই পাক বাহিনীকে ডিভিট করে ছিনিয়ে এনেছি ক্রাউন অফ লিবরেশন বা স্বাধীনতার মুকুট। আর এ জন্য আমাদের দেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, চিরঋণী। যাদের কথা আমরা সারা জীবন স্মরণ রাখব। কেননা তাদের মহান স্যাক্রিফাইসের জন্যই আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীনতা, একটি বিজয় দিবস তথা ১৬ই ডিসেম্বর।

শালগড়িয়া,
(শাফলা প্লাস্টিকের উত্তর দিকে)
ভ্যাট এন্ড কাস্টমস্ অফিসের ডান পার্শ্বে
পাবনা সদর, পাবনা

অপারেশন গুরই

একেএম আনোয়ারুল হক

বাঙালির সুদীর্ঘকালের ইতিহাস রণাঙ্গনের ইতিহাস। যুগে যুগে তারা সংগ্রাম করেছে কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেনি। ন্যায্য অধিকার আদায়ের ইতিহাসে দালাল মীর জাফরের কারণে বাঙালিরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে গুরই গ্রামে এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। এই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমি নিজে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। আমার যুদ্ধকালীন সময়ের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে গুরই গ্রামে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা।

১৯৭১ সালে ৬ সেপ্টেম্বর ফজরের নামাজের পর কয়েকজন জেলে হিলচিয়া ক্যাম্পে সংবাদ পাঠায় যে, আজ নিকলী থেকে লঞ্চ ও নৌকা নিয়ে কারার মাহতাব উদ্দিনের ও কারার বাহরের নেতৃত্বে রাজাকারদের দল পাকবাহিনীকে সঙ্গে করে গুরই গ্রাম আক্রমণ করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারি যে, নিকলী হতে ৫-৬টি নৌকা ও একটি লঞ্চ নিয়ে পাকবাহিনী গুরই গ্রাম আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমি, কমান্ডার মহিউদ্দিন ভাই, মেজু ও সাহেদ আলী একটি স্টেনগান ও কিছু গ্রেনেড নিয়ে একটি নৌকায় এবং অন্য একটি নৌকায় প্রায় ৭-৮ জন কিছু অস্ত্র নিয়ে গুরইর দিকে রওয়ানা হই। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরই গ্রামের পূর্ব পাড়ার ইমাম বাড়িতে নামি। অপর নৌকাটির ভসু, ইয়াকুব আলী, আঃ বারী খান, নূরুল ইসলাম, সমু, বেচু, মাহতাব, নেফর আলী পাড়ার ভেতর ঢুকেছে। পাড়ায় উঠেই দেখতে পেলাম যে, ৪ জন রাজাকার একটি নৌকায় নিরস্ত্র অবস্থায় লুণ্ঠিত মালামাল পাহারা দিচ্ছে। এদের ধরে হাত-পা বেঁধে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। আরও ২-৩টি বাড়ি পার হতেই দেখি ৩ জন রাজাকার রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে, ১ জন লুণ্ঠিত মালামাল বালতিতে করে এবং অন্য ২ জন মালামালসহ একটি সাইকেল নিয় নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের দেখেই সমু আড়াল থেকে ফায়ার করে একজনকে ধরাশায়ী করে ফেলে। সমুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একসঙ্গে ফায়ার করে ২ জনকে মেরে ফেলি। তাদের রাইফেল ও গুলির প্রসেজ খুলে নিই। অন্য ৩ জনকে গুলি করে ধরাশায়ী করি। গুলির আওয়াজে অন্যান্য রাজাকার আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তারাও গোলাগুলি শুরু করে। আমরা ফায়ার করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হই; রাজাকাররা পিছু হঠতে থাকে। পূর্ব পাড়ার অর্ধেকেরও বেশি অতিক্রম করে মহরম আলীর বাড়ি পৌছে দেখি, আমার ভাগ্নে নূরুল ইসলাম পাড়ার পূর্ব দিকে ধৈঞ্চা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রায় শেষ প্রান্তে পৌছে কোনার হাটিতে দাঁড়ানো ২ জন পাকসেনাকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরাও গুলি ছুঁড়তে থাকি। উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমাদের গুলিতে ২ জন রাজাকার ও ৩ জন পাকসেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাড়ার মুক্তিকামী লোকেরা সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হয়। তাদের দ্রুত পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বলি। পাকসেনাদের মূল গ্রুপ মসজিদপাড়ায় অবস্থান করছিল। পাকবাহিনীর ভয়ে এ পাড়ার সমস্ত নারী-পুরুষ মসজিদের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল। পাকসেনারা মসজিদের ভেতর প্রায় ৫০-৬০ জন নারী-পুরুষ-শিশুকে জড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখতে পায়। মসজিদের ভেতর থেকে তাদের টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। রাজাকারদের মাধ্যমে তাদের বোঝানো হয় যে, সৈন্যরা পাকিস্তানি এবং ভালো। কিন্তু মুক্তিসেনারা সন্ত্রাসী এবং খারাপ। মুক্তিসেনাদের ধরিয়ে দেয়া উচিত। তখন তারা আম্তা আম্তা করে বলে, এখানে কোনো মুক্তিসেনা নেই। মুক্তিসেনা পেলে ধরিয়ে দেবে। নারী ও শিশুর কান্নাকাটির ফলে পাক কমান্ডার তাদের বাড়ি চলে যেতে বলে। মসজিদে অন্যান্যের সঙ্গে আমার বড় বোন মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলামের মাও ছিলেন। তাকে চিনতে পারলে, ছেলে মুক্তিযোদ্ধা এ অপরাধে তাকে হয়তো তৎক্ষণাৎ নির্যাতন করতে করতে মেরে ফেলতো। এরই মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ পূর্ব পাড়ায়

গোলাগুলির শব্দে পাকসেনারা মনে করে গোলাগুলি হয়তো নিজরাই করছে। একজন রাজাকার মারফত গুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। রাজাকারটি জোরে চিৎকার দিয়ে গুলি বন্ধ করতে বলে। গোলাগুলি বন্ধ হচ্ছে দেখে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন কোনারহাটি হতে রাজাকাররা দৌড়ে মসজিদপাড়ায় এসে তাদের কমান্ডারকে বলে যে, মুক্তিযোদ্ধারা পূর্বপাড়া আক্রমণ করেছে। গুলিতে কোনারহাটিতে ২ জন পাকসেনা নিহত হয়েছে। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা মেশিনগানের ফায়ারে পূর্ব পাড়া ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। তখনও আমরা সেখানে যুদ্ধ করছি। হঠাৎ দীঘির পশ্চিম পাড় থেকে বৃষ্টির মতো গুলি পূর্বপাড়ায় এসে পড়ে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। একজন গ্রামবাসী আমাদের কাছে এসে বলে যে, লঞ্চের ওপর একজন পাকসেনা অদ্ভুত একটা যন্ত্র দিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে বলছে। আমরা বুঝতে পারি পাকসেনা ওয়ারলেস দিয়ে সাহায্য কামনা করছে। এখনই হয়তো মেজর দুররানী সরারচর ও বাজিতপুরের ইউনিটকে সাঁড়াশি আক্রমণের নির্দেশ দেবেন। এদিকে বৃষ্টির মতো গুলি আসছে তো আসছেই। এ অবস্থায় পিছু হটা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তাই কমান্ডার মহিউদ্দিন ভাই পিছু হটার নির্দেশ দেন। আমরা দৌড়ে ইমামবাড়িতে চলে আসি। কোনো রকমে নৌকায় উঠে সবাই শুয়ে পড়ি। মাঝিরাও ভয়ে শুয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সবাই শুয়ে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য, তাই মাঝিকে নৌকা ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ভয়ে কেউই বৈঠা হাতে নিচ্ছে না। আমাদের সাহসী সঙ্গী সমু বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করে। তখন মাঝি তরিবুল্লাহ, আবু ও খুর্শিদ দাঁড় টানতে শুরু করে। নৌকা দক্ষিণে দৌলতপুরের দিকে যেতে থাকে। গুরই ও দৌলতপুরের মধ্যে প্রায় ১-২ মাইল ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠ নিরাপদে অতিক্রম করতে পারলেই আমরা বাঁচতে পারব। মাঠের মাঝামাঝি আসতেই আমাদের বাড়ি থেকে পাকসেনারা আমাদের দেখে নৌকা লক্ষ্য করে মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। আমাদের বাড়ি মসজিদ পাড়ার দক্ষিণ মাথায় অবস্থিত। ফায়ারের গুলি আমাদের নৌকার ৫-৬ হাত পেছনে পড়ে। আবার ফায়ার করে। এবার গুলি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ২-৩ হাত সামনে গিয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহতায়ালার অসীম রহমতে পাকসেনাদের ব্রাশ ফায়ারের হাত থেকে বেঁচে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের নৌকা দ্রুত বরমাইপাড়ার দিকে চলতে থাকে। আবারও পাকসেনারা আমাদের লক্ষ্য করে ফায়ার করে। এ ফায়ার বরমাইপাড়ার গোলাপ চেয়ারম্যানের বাড়িতে গিয়ে পড়ে। গুলির আঘাতে ঘরের চাল ও বেড়ার টিন ছিদ্র হয়ে যায়। আমরা জৈনতপুরের দিকে যেতে থাকি। সকাল ১০-১১টার দিকে জৈনতপুরে ঘোড়া মৌলভীর পাড়ায় আশ্রয় নেই। আমাদের সংবাদ পেয়ে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা এবং এলাকার প্রায় সবাই সমবেত হয়। সঙ্গী নেফর আলীকে অনুপস্থিত দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। সে মারা গেছে না ধরা

নৌকা নিয়ে আমাদের বাড়ির পাশের খালে ঢুকে দেখি, আমাদের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পূর্ব পাড়ার রহমত আলীর ঘাটে নৌকা ভিড়াই। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা ঘরের আগুনে পুড়ছে আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পাড়ায় উঠে ২-৩টি বাড়ি পার হয়ে দেখতে পাই ১টি লাশ পুড়ে বীভৎস রূপে মাটিতে পড়ে আছে। বুঝতে পারি তাকে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে

পড়েছে, সেটা কেউ বলতে পারছে না। মৌলভী সাহেবের ছেলে সামসুদ্দিন বিভিন্ন ঘর থেকে ভাত তরকারি এনে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। খাবার খেয়ে ব্লক হয়ে যাওয়া রাইফেলগুলো পুল থ্রো করে পরিষ্কার করি। হাতিয়ার ও এমুনেশান নিয়ে আবারও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। ইতিমধ্যে নেফর আলী হাতিয়ারসহ এসে পৌঁছে। সে জানায় যে, পূর্ব পাড়ায় আমাদের ছেড়ে পানিতে পজিশন নিয়ে ফায়ার করতে করতে একদম উত্তরের মাথায় চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে গোলাগুলি থেমে যাওয়াতে বিপদ বুঝতে পেরে, ধৈঞ্চা ক্ষেতে ডুব দিয়ে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে প্রায় ১/২ মাইল পূর্বে সরে যায়। একটি জেলে নৌকা দেখতে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ করে। তারা তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায়। নতুনভাবে আবার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। আমরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে নতুন পরিকল্পনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। ইতিমধ্যে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর দিকের আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম আমাদের বাড়িসহ পুরো গ্রামে পাকসেনারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি, মহিউদ্দিন ভাই, ভসু, দেয়ারিশ মিয়া, নূরুল ইসলাম, ছিদ্দিক, বেচু, সমু, হাশিম, নেফর আলী, কফিল উদ্দিন, সাহেব আলী, কেন্তু মুন্সী ও নৌকার মাঝিদের নিয়ে একটি চার দাঁড়ের বড় নৌকায় গুরই যাওয়ার জন্য হিলচিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে অবস্থান নেই। ইতিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি একটু কমলে পাড়াবাজিতপুরের পশ্চিম মাথা দিয়ে বিয়াতিরচর মসজিদের কাছে যাই। আমাদেরকে দেখে ২/১ জন জেলে এসে বলল, কিছুক্ষণ আগে পাকসেনারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় আমাদের বাড়ি ও সমস্ত পূর্ব পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং অনেক লোককে গুলি করে মেরেছে। নৌকা নিয়ে আমাদের বাড়ির পাশের খালে ঢুকে দেখি, আমাদের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পূর্ব পাড়ার রহমত আলীর ঘাটে নৌকা ভিড়াই। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা ঘরের আগুনে পুড়ছে আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পাড়ায় উঠে ২-৩টি বাড়ি পার হয়ে দেখতে পাই ১টি লাশ পুড়ে বীভৎস রূপে মাটিতে পড়ে আছে। বুঝতে পারি তাকে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। কি বীভৎস দৃশ্য! কাছে গিয়ে দেখছি, এ লাশ কার? হঠাৎ আমাদের সঙ্গেরই যোদ্ধা ছিদ্দিক ভাই, ভাই বলে চিৎকার করে লাশটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। মৃত ব্যক্তিটি সিদ্দিকের বড় ভাই ইয়াকুব আলী। সিদ্দিকের সান্ত্বনা দেবার ভাষা তখন আমাদের ছিল না। তবুও এই শোককে শক্তিতে পরিণত করার কথা বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ৪-৫টি বাড়ি পার হতেই ইন্তাজ ব্যাপারীর বৈঠক ঘরের বারান্দায় একটি শিশুর কান্না শুনতে পাই। অন্ধকার বারান্দায় টর্চের আলো ফেললে দেখতে পাই শিশুর মাকে পাকসেনারা গুলি করেছে। গুলির ফাঁকে আল্লাহর রহমতে এই নিষ্পাপ শিশুটি বেঁচে আছে। টর্চের আলোতে মহিলাকে চিনতে পারি। তিনি আমাদের সঙ্গী কেন্তু মুন্সির চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী। শিশুটিকে এক সঙ্গী কোলে তুলে নেয়। চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার রাত নেমে এসেছে। শ্মশানের আগুনের মতো পাড়ার ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। জনমানবহীন পাড়াটিকে একটি ভূতুড়ে গুহার মতো মনে হচ্ছে। আর আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যেন সেই গুহায় প্রবেশ করছি। আমাদের শব্দ পেয়ে এদিক সে দিক লুকিয়ে থাকা ৩/৪ জন বৃদ্ধ এগিয়ে আসে এবং আমাদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে পাকসেনারা যে নির্মম বর্বরতা ও নৃশংসভাবে মানুষজন হত্যা করেছে তার বর্ণনা দিতে থাকে। তাদের কথা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। ইসলাম ধর্মের শান্তির পতাকাবাহী মুসলমান, এত নিষ্ঠুর কীভাবে হয়? তাদের কথামত খুর্শিদ মিয়ার বাড়ির পূর্ব পাশের কলা গাছের তলায় বেশ কিছু লাশ দেখতে পাই। অনেকগুলো নিরীহ লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে একসঙ্গে দাঁড় করে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করেছে। পাড়ার উত্তর মাথায় নবী নেওয়াজের বাড়িতে আরও ৬ জন নারী-পুরুষকে বর্বর পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করে। এ পাড়ায় আমরা মোট ২৫ জনের লাশ দেখতে পাই। আমরা ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। লাশগুলো শিয়াল-কুকুরে যেন না খেতে পারে তার জন্য হারিকেন জ্বালিয়ে লাঠি হাতে সবাই একত্রে জেগে থেকে রাত কাটাতে হবে। আজ আমরাও গ্রামে থাকব এ আশ্বাস দিয়ে মসজিদ পাড়ায় চলে আসি। তবে নিরাপত্তার জন্য আমরা গোপনে হিলচিয়া ক্যাম্পে চলে আসি। রাতে আমাদের কারও চোখেই ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে শুয়ে বসে জেগে থেকে কোনো রকমে রাত কাটাই।

৭ সেপ্টেম্বর ভোর বেলায় গুরই গ্রামে এসে লোকজন ডেকে এনে আমিন মুন্সীর দ্বারা

লাশগুলোর কোনো রকম দাফন কাফনের ব্যবস্থা করি। সমস্ত গ্রাম ঘুরে সবার খবরাখবর নিতে থাকি। গ্রামবাসীরা সব কিছুকেই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাকে। আমাদের সোর্স নিকলী থেকে খবর নিয়ে আসে, পাকসেনাদের ৪টি লাশ হেলিকপ্টারে করে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৬ রাজাকার ও পুলিশের লাশ কিশোরগঞ্জে পাঠানো হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মেজর দুররানী নিকলীতে খুব ভয় ও আতঙ্কে রয়েছেন। নিকলী স্কুলের ক্যাম্পে নিরাপত্তা জোরদার করেছেন। এ সংবাদে আমাদের মনোবল বেড়ে যায়। রাতে আমি, কমান্ডার মহিউদ্দিন ভাই, অধ্যাপক ইয়াকুব আলী, দেয়ারিশ মিয়া, ভসু ও বারী খানকে নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, পাকবাহিনী যেকোনো মুহূর্তে আমাদের ক্যাম্পে সাঁড়াশি আক্রমণ করতে পারে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের আরও শক্ত ও ভারী হাতিয়ারের প্রয়োজন। তাই আবার ভারত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ৩নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারে ট্রাকে করে মনতলা (তেলিয়ামুড়া) গিয়ে কমান্ডার মহিউদ্দিন ভাই সেক্টর কমান্ডার কর্নেল শফিউল্লাহর কাছে গুরই গ্রামের যুদ্ধের বর্ণনাসহ তার রিপোর্ট দেন। গুরই গ্রামের যুদ্ধের কথা ভারতীয় পত্রিকা বসুন্ধরাতে প্রকাশিত হয়।

গ্রাম : গুরই, পো : হিলচিয়া
থানা : নিকলী, জেলা : কিশোরগঞ্জ

আমি কি মুক্তিযোদ্ধা

রফিকুল ইসলাম ভূঞা

২৬ মার্চ রাত সাড়ে আটটার দিকে মসজিদের কাছ থেকে প্রথমে একটি গুলির আওয়াজ। বাসার পেছনে নেভিব্যারাক। মিনিট কয়েকেই শুরু স্বয়ংক্রিয় বিভীষিকাময় যুদ্ধ। প্রতিটি আওয়াজ তিন-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হয়। অসংখ্য চেনা-অচেনা আওয়াজ ও প্রতিধ্বনিসহ এক অসহায় লোমহর্ষক মৃত্যুপুরীর ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে। বাথরুম সংলগ্ন করিডর ছাড়া সব বাতি নিভিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আগুন খেলা দেখছি। ঘরেবাইরে বাতি নিভানো থাকলেও গুলির আলোতে ঘাসও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা গুলি ব্যালকনি সংলগ্ন শয়নকক্ষের জানালা ভেদ করে ঘরে ঢুকে যায়। আমার অসুস্থ স্ত্রী নিজ বিছানা ছাড়তে রাজি নন। সবগুলো জানালায় লেপ-তোষক, কাঁথা-কম্বল আটকিয়ে দিলাম। গোলাগুলির তীব্রতায় প্রায় নিষ্প্রদীপ ঘরে হারিকেনের মৃদু আলোয় স্ত্রী ভিন্ন সবাই করিডরে। মা-শিশু-ভাগনি সবাই ম্যালেরিয়া রুগীর মতন কাঁপছে। ক্রসফায়ারের মাঝখানেও ব্যতিক্রম ভাই, ওঘরে শোয়া স্ত্রী ও আমি। ঘরের ভেতরে প্রথমে পাকঘরে পরে আরও পাঁচটি চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা গুলি ঘরে ঢুকেছে। ঘনঘন স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অনড়। ছুবেহ সাদেকের সময় গোলাগুলির তীব্রতা একটু কমে। কত লক্ষ রাউন্ড গুলিবর্ষিত হয়েছে দু'পক্ষের কমান্ডারেরা জানেন। নজরুল খেজুরতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে। মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে। দেখলাম, হামাগুড়ি দিয়ে পেছন থেকে পাহাড়ে উঠে গেল।

থেমে থেমে সারাদিনই গুলি চলে। বিপ্লবী-বেতারও থেমে থেমে জানাচ্ছে, বিশেষ ঘোষণার অপেক্ষায় থাকুন। একসময়, আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ...। পরে অবশ্য তিনি আরেকবার ঘোষণা দিলেন, আই, মেজর জিয়াউর রহমান, ফর অ্যান্ড অনবিহাফ অব আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার... ইত্যাদি। মৃদুকণ্ঠের দু'টি ভাষণই স্পষ্ট। হান্নান সাহেবের মত অনলবর্ষী না হলেও জিয়ার দ্বিতীয় মৃদুভাষণে স্বাধীনতা ঘোষণার সব উপকরণই সন্নিবেশিত ছিল। বঙ্গানুবাদসহ দ্বিতীয় ভাষণটি কালুরঘাট পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন ক্রমাগতভাবে স্বকণ্ঠে প্রচার করেছেন। বঙ্গানুবাদ করেছিলেন নোয়াখালীর শফিউল্লাহ (বাঙাল শফি এবং কলমদার শফি নামে লেখালেখি করতেন পাকিস্তান আমলে) ডা.জাফর অথবা ডা.সাঈদুর রহমানের বাসায়, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে। স্বাধীনতার পর বঙ্গানুবাদের কাটাছেঁড়া খসড়াটি তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার আগ্রাবাদ কলোনির বাসায় নবীন-প্রবীণ লেখক যারা যাতায়াত করতেন তাদের মধ্যে মামুন নামের এক ছাত্র ছিলেন (ড. মুনতাসির মামুন কিনা?) এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খানের পিএস ক্যাপ্টেন আহমেদের ঢাকার দিলু রোডস্থ বাসায় আমি দু'বার গিয়েছি তার সাথে। চিরকুমার মরহুমের যেকোন স্বীকৃতি আমাকে শান্তি দেবে।

অনেক আশাভরসা নিয়ে শমসের মবিনের কণ্ঠে মেজর জিয়ার ভাষণ শুনছি। জরুরি তলবে হাজির হলাম ক্যাপ্টেন রফিকের কাছে। তিনি বাটালি-রেলহিলের মাঝের ছোট রাস্তায়। সরাসরি আদেশ, আধাঘণ্টার মধ্যে বাসা ত্যাগ করুন। বললাম, একি সম্ভব? তিনি বললেন, এটা যুদ্ধক্ষেত্র। আপনাদের ঘরগুলো শত্রুর ঘাঁটি। আমরা অন্যত্র যাচ্ছি। ওরা যাকেই পাবে হত্যা করবে। কাতরকণ্ঠে বললাম, এতগুলো পরিবার বাচ্চা-কাচ্চা, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ অত অল্পসময়ে কোথায় এবং কিভাবে যাবো? দেখলেন তো, সামান্য জায়গাটুকু দৌড়ে আসতে ছয়টা গুলি করেছে। কানে মুখ এনে আস্তে বললেন, আমাদের গুলি এখনে ফুরিয়ে গেছে। সবাই সরে পড়ুন। একঘণ্টা কভারেজ দেবো। খালি জায়গাটা ক্রলিং করে যাবেন। সবিনয় নিবেদন, অন্তত দু'ঘণ্টা কভারেজ দিন। নীরবে তিনি পাহাড়ে উঠে গেলেন।

আদেশ শুনে চল্লিশ মিনিটেই টাইগারপাস এলাকা ছাড়া শুরু হলো। যে যেদিকে পারলো গেল। সিঁড়িটি গানরেঞ্জের মধ্যে। কয়েক পরিবারের মোট বায়ান্নজন বাটালীর গা-বেয়ে উঠছি। ছোটভাইটা সকাল থেকে ইপিআর ডিউটিতে। বাচ্চা ও আম্মাকে অন্যরা সাহায্য করলেন। অসুস্থ স্ত্রী ও আমি সবার পেছনে। খাড়া পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা শেল এসে স্ত্রীর মাথার ছয়ইঞ্চি দূরে পাহাড়ে ঢুকে গেল। ধুলাবালিতে চোখমুখ ঢেকে গেছে। একদম নিস্পন্দ। ভাবছি মরে যায়নি তো? শার্ট খুলে ধুলাবালি পরিষ্কার করে দেখি, শেল গায়ে লাগেনি। বাকি অর্ধেক ছেঁচড়িয়ে তুলছি। হিলটপের কাছাকাছি যেতেই অন্যমহিলারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধরাধরি করে এক বাংলোর পেছনের বারান্দায় শুইয়ে দিলেন। সব বাংলো খালি। মিসেস বকর চলে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীকে নিজের বেডরুমে শুইয়ে চাবির গোছা হাতে দিয়ে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন রফিকের দীর্ঘায়ু হোক। গুলি ফুরিয়ে যাবার মুখেও দু'শতাধিক নিরপরাধ অসামরিক লোকের নিরাপত্তায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, কভারেজ দিলেন সন্ধ্যার পর পর্যন্ত। পেছনেই বসতিপূর্ণ উপত্যকা মতিঝর্ণা। আবার বাটালী। বাটালীহিলের এ অংশ উভয়পাশেই খাড়া। ঝোঁপজঙ্গল, বেত-বাঁশের ঝাড়। সরিসৃপ জাতীয় ও চতুস্পদ প্রাণীর অস্তিত্ব প্রচুর। ভাঙ্গাকাচ ও গৃহস্থালী বর্জ্যে ভরপুর পেছন দিকটা। ওপারের পাহাড়ের ইপিআররা আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন রাইফেল উঁচু করে।

দুরাত দুদিন নির্ঘুম টেনশন, ছাব্বিশের দৌড়াদৌড়ি, সাতাশে চিড়েমুড়িতে দিন কাটানো, গোলাগুলির মুখে হাজারফুট পাহাড় বাওয়ায়, সবাই নিস্তেজ অবসন্ন। হিলটপে অভুক্তরাতে যুবাবৃদ্ধদের নির্ঘুমই কাটে। প্রত্যুষেই দুঃসংবাদ, বাটালীটপে নেভিপুলিশ হাতাহাতি যুদ্ধ। দু'বাংলোর মাঝখান দিয়ে দেখি পিডব্লিউডির সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সুলেমান খানের গেটে পুলিশ দারোয়ান ও নেভিসেনার মধ্যে অস্ত্র কাড়াকাড়ি চলছে। হিলটপে পৌঁছার রাস্তা ও সিঁড়ি দুটোই ওখানে মিশেছে। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে পেছনের দুর্গম পথেই নামতে হবে। মাঝপথেও পৌঁছিনি, নেভিসেনারা আমাদের গুলি শুরু করে। ওপাহাড় থেকে ইপিআরও পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। মতিঝরনার একজন হাতের ইশারায় তাড়াতাড়ি

নামতে ডাকছেন। চোখের সামনে নেভির গুলিতে তার আঙ্গুল উড়ে গেল। নেমে একটা ছনেরঘরে গাদাগাদি করে সবাইকে ঢুকিয়ে সরকার সাহেবসহ উপত্যকা থেকে বেরুবার নিরাপদ পথের সন্ধানে চলে গেলাম। আধাঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে আবার যাত্রা শুরু। আম্মা ও রেলওয়ের মিসেস রাজ্জাককে আবিষ্কার করলাম, ঘনপাতা বিশিষ্ট এক শিম ঝাড়ের নিচে। ক্রসফায়ার থেকে আত্মরক্ষায় তারা বেছে নিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়। এমআর সিদ্দিকী ও একে খানের বাংলোর নিচ দিয়ে পাহাড়িপথে আমবাগান পৌঁছি। কয়েকটি খালিঘরে সশস্ত্র যুবকরা থাকার অনুরোধ করলো। অনেকে রাজি। যুবকদের বললাম, একদিকে নেভি অন্যদিকে অবাঙালি, তোমাদের ৩০ রাইফেল যথেষ্ট নয়। সাবধানে থেকো। কাফেলায় বেরিয়ে গ্রামের পথ ধরে রাত আটটায় রঙ্গিপাড়ায়, আমার বড়ভাই শফিক সাহেবের বাসায়। দেড়মাইল আসতে সাড়ে বারো ঘণ্টা লেগেছে। ছোটবড় আমরা বায়ান্নজন। ভাইভাবীর প্রথম প্রশ্ন, নজরুল কোথায়? জবাব, ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে। মিসেস রাজ্জাক আবারও ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আম্মা আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করলেন, বেঁচে থাকলে দেখা হবে নিশ্চয়। নিশ্চিত থাকো, আমাদের যে অবস্থা হবে তোমারও তাই হবে। প্রয়োজনে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো। রাত এগারোটার দিকে নজরুলের সাথে রাজ্জাকও এলেন।

রঙিপাড়া ইপিআর হেডকোয়ার্টার হালিশহরের অতিনিকটে। হাতাহাতি যুদ্ধে অনেক হতাহত। হালিশহরের পতনের পর কতিপয় সেনা তাদের গুলিহীন রাইফেল ভাইয়ের বাসার পেছনের নালায় ফেলে অন্যত্র চলে গেছেন। গভীর রাতে নিজ বাসায় গুলিবিদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে এলেন এক সৈনিক। একটি বাসা তাদের ছেড়ে দেয়া হলো। ওই বাড়ির সব ভাড়াটে বাসার চাবি ভাইকে দিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। মহিলারা সেনাপত্নীর সেবার দায়িত্ব নিলেন। কারফিউর মধ্যে পরদিন ডাক্তার নিয়ে গুলিবিদ্ধর ঘরে ঢুকলে পর্দানশীন ভদ্রমহিলা অন্তিম মুহূর্তেও ঘোমটা টানতে টানতে ইহলোক ত্যাগ করলেন। আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদকে যথাযথ মর্যাদায় সমাহিত করলাম। গোরস্থান হতেই স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধের কসম খেয়ে, সৈনিক অন্য ঘাঁটির উদ্দেশে চলে গেলেন। দিনভর পাকিস্তানি বর্বরদের বিমান হামলা ও বাবর জাহাজ হতে মুহুর্মুহু কামান দাগা চলতে থাকলো ৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম মহানগরের পতন পর্যন্ত। ছোটভাইটি প্রতিদিনই বেরিয়ে যায় সকালে, ফিরে রাতের অন্ধকারে। তার কাছেই খবর পেতাম, অলিগলি-রাজপথের হাতাহাতি লড়াইয়ের। হানাদার নিহতের খবরটা বলতো আনন্দের সাথে। বাঙালি নিধনের খবর জানতে চাইলে মুখ মলিন করে থাকতো। বেশ কষ্টে সংগ্রহ করতে হতো কিভাবে কোর্ট বিল্ডিং হাতছাড়া হয়, কি ঘটে মেডিক্যালে, ১০ এপ্রিল কালুরঘাটে দুশমনরা কীভাবে ঢুকে পড়ে।

৩০ মার্চ কার্ফ্যু, এয়ারঅ্যাটাক-নেভ্যালশেলিংয়ের মধ্যেই গলিপথে দেওয়ানহাট সিএসডি'র উদ্দেশ্যে বেরুই। ঈদগাহ'র কাছে দেখি জ্বলে যাওয়া একজন মানুষের হাড়ের হলুদ মাংস ঠুকরে খাচ্ছে দাঁড়কাক। পিছিয়ে এসে ঝোপের রাস্তায় সামান্য এগুতেই আরেক নৃশংস দৃশ্য। এক ভদ্রলোক ড্রেনপাইপের ভেতর থেকে উঠেই পড়লেন দু'পাকির সামনে। দু'হাত উপরে তুলে পাগলের মতন ক্রমাগত লাফাচ্ছেন। মুখে, বা-জি স্যারেণ্ডার! বাজি সারেণ্ডার!! একটি নরপশু বেয়নেট বসিয়ে দিল বুকে। চট্টলসন্তানের ময়লাগেঞ্জিতে অংকিত হলো রক্তিমসূর্য। সামনে চোখ রেখে সন্তর্পণে পেছনে হাঁটছি। অন্য পিশাচটাও বেয়নেট চার্জ করে। লোকটার গোঙানির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এমন নৃশংস দৃশ্য জীবনে দেখিনি। পেছন থেকে একজন জাপটে ধরে। স্নায়ু বিপর্যয়ে চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়েছে। শুশ্রূষায় সংবিত পেয়ে ফিরে ভাবছি, কথিত মেজর পত্নী বারাঙ্গনা না হয়ে বীরাঙ্গনা হলে গর্ববোধ করতাম।

রেডিওতে কাজে যোগদানের ঘোষণা। নাহলে কঠোর ব্যবস্থা। তিনভাই সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রামে চলে যাবো। ১২ এপ্রিল রওনা হয়ে ১৭ এপ্রিল বাড়ি এলাম। পথে পথে পাঁচদিন জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিল। এককাপড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। বড়-ছোট ভাইয়ের প্যান্টশার্ট গায়ে লাগেনা। লুঙ্গি ১ পাঞ্জাবী ও জুতো বড়ভাই দিয়েছেন। গ্রামের বাজার থেকে একটি প্যান্ট বানাই। পথে মুরাদনগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়ালী আহমেদের (পরে এমপি) সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ফিরে গেলে তিনি এমএনএ হাজী আবুল হাসেমের কাছে নিয়ে গেলেন। পরদিনই হোমনা থানায় (আমাদের বাড়ি) এলেন এমএনএ। ডা. ওয়ালী প্যাডের প্রতিটি ব্ল্যাংক পাতায় সই করে সিল মেরে দেন। বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক যোগ্য ছেলেদের নাম ধাম লিখে আগরতলা পাঠিয়ে দিতে। হাজী হাসেমসহ কয়েকটি গ্রাম ঘুরে বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে কমিটি করা হলো। এমএনএ চলে গেলেন থানার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে।

কুমিল্লা-আখাউড়া সেকশনের রাজাপুর-নয়নপুর স্টেশনের মাঝামাঝি সীমান্ত গ্রাম পুটিয়া দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেই। চব্বিশ মাইল পায়ে হেঁটে রেললাইন পেরিয়ে একটা রিকশায় উঠি। তিন চার মিনিটের মধ্যেই একদল পাকসৈন্য এসে হ্যান্ডস্আপ করায়। সুবেদারের কর্কশ ভাষায়, কাঁহা জায়েগা? শান্তভাবে জবাব দেই, চিটাগাং অফিসে যোগদান করতে যাচ্ছি। আরো কর্কশস্বরে ধমকে ওঠে, চালাকির

জায়গা পাও না? সত্যি বলো, ইন্ডিয়া যাচ্ছিলে না? রিকশাওয়ালার চেহারায় সহমর্মিতার আভাস। বিনয়ের সাথে বললাম, মেইনরোড দিয়ে গেলে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ভয়ে দেহাতি রাস্তার পথ ধরেছি। ইণ্ডিয়ার পথ চিনি না। চট্টগ্রাম যাবো। ওখানে চাকরি করি। স্বরের কর্কশতা কমিয়ে বলে, ডান্ডিকার্ড হ্যাঁয়? বললাম, রেডিও পাকিস্তানের পাস আছে। পকেট থেকে বের করে পাস দেখালাম। এবার রিকশাওয়ালাকে প্রশ্ন করে, বাতা! কাঁহাকা কেরায়া লিয়া? জবাব দেয়, শংকুচাইল। অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে বলে, তোমা বাতায়া চিটাগাং আওর উ কাঁহা সেংকোচাল! আভি ছাচ ছাচ বাতাও তোম কিধার জানে থে? মৃদু হেসে বলি, চিটাগাং এখান থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। আমি ওখানকার অফিসার। রিকশায় শংকুচাইল পৌঁছে কাছেই ফকিরহাট স্টেশন। রেললাইন দিয়ে হেঁটে কুমিল্লা গিয়ে চট্টগ্রামের ট্রেন ধরবো। অফিসার শুনেই ব্যবহার নরম হলো। বললো, আপ রেডিও পাকিস্তান আফছার হোঁ? মাথা নাড়লাম। সুবেদার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, ঠিক হ্যায়, আপ হামলোগোকা সাথ্ চলিয়ে। আমি রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিতে গেলাম। তিনি পয়সা নিলেন না; বরং আমার নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিলেন। এতে আমার প্রতি পাকসেনাদের আচরণে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হলো। আমিও খেটে খাওয়া মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলাম।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এনে ওরা কেসট্যাবলে সোপর্দ করলো। একজন মেজর আমার বক্তব্য শুনলেন। চট্টগ্রাম রেডিওর পাস, থানায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে (ব্যাকডেটে) পেশ করা জয়েনিং রিপোর্টে সুপারিশ ও স্বেচ্ছায় দেয়া টেস্টিমনিয়াল (যেখানে লেখাছিল, হি শুড বি স্পেয়ার্ড ইন এভরি স্টেপ)। সর্বোপরি যাতায়াতের প্রথম সুযোগেই কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা, আমাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করলো। মেজর ঢাকা হয়ে স্পেশাল লঞ্চে আর্মির জোয়ান ও অফিসারদের সাথে অফিসারের মর্যাদায় নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। ঢাকা এসে আমি একটি আইডেন্টিটি কার্ড তৈরির অনুমতি পেলাম। নওয়াবপুর রেললাইনের পাশে বক্স ক্যামেরায় দুটি ছবি করিয়ে হেডঅফিসে এলে কোনো বাঙালি অফিসার আইডেন্টি কার্ড সই করতে রাজি হলো না। অথচ তারা সবাই আমার অত্যন্ত পরিচিত এবং অনেকে নেতা মানেন। তবে বাড়িতে আমার অবস্থান জানানোর সুযোগ হলো। পাহারাদার হিসেবে আগত সিপাইদের সাথে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবার পূর্বমুহূর্তে আবু মোহাম্মদ নামে এক বিহারী সহকর্মীর সাথে দেখা। তিনি তার কক্ষে নিয়ে নিজে একটি পরিচয়পত্র লিখে সই সিলসহ হাতে দিয়ে বললেন, দেখো ইয়ার, কোই গরবর মত করো। মেরা নোকরি চলা জায়েগা। আইট্রাস্ট ইউ। জবাবে বললাম, তোম মেরা পিয়ারা দোস্ত হো, মুঝপর একিন রাখখো আওর দোয়া কারো! আবু মোহাম্মদ গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সিপাই দুজনকে চা-নাস্তা খাইয়েছিল। ওরা কোনো অফিসারের কক্ষেই ঢুকেনি। জাহাজে গিয়ে, আবু মোহাম্মদের দোস্তির কথা বলায় আমার দাম আরো বেড়ে গেল।

একদিন এক রাত পর চট্টগ্রাম সদর ঘাটে পৌঁছে অফিসাররা বিদায় নিলো। আমি আগ্রাবাদ কলোনিতে চলে গেলাম। চট্টগ্রাম ত্যাগের আগেই জেনেছিলাম, বাটালীর বাসার সবকিছু লুটে নিয়েছে। পরদিন যথারীতি যোগদান করলাম। তিনদিন পর দলবেঁধে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের কাজ দেখতে যাই। ওখানে সুলেমান খান আমাকে দেখেই আঁৎকে ওঠেন। প্রশ্ন করেন, তুমি জয়েন করেছো? তোমাকে তো ওরা মেরে ফেলবে। উপস্থিত আবু বকর, রশিদ সরকার, জহির শাহ কোরেশী সবার চেহারা মলিন। রুহুল মতিন জানতে চাইলেন, স্যার আপনার এমন কোন রিপোর্ট আছে। তিনি বললেন, না। তবে লোকমুখে অনেকদিন বলাবলি হচ্ছে। আমি বললাম, তবে কি স্যার, আমি চলে যাবো? কোথায় যাবে? যেখানেই যাও, তোমাকে তো ধরে আনবে। ভারতে চলে যাবো। তিনি বললেন, বলা যত সহজ, যাওয়া তত সহজ নয়। দেখা যাক, আর ইউ খানের সাথে আলাপ করে নেই। বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও কমোডর মমতাজকে প্রত্যাহারের পর আর ইউ খান পূর্ব পাকিস্তান নেভির দায়িত্বে আছেন। মেরিন অ্যাকাডেমির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব আমার ওপর থাকায় খান ও তার পরিবার আমাকে ভালো জানেন।

চার পাঁচ দিন পর চট্টগ্রাম সিজিও বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আমার অফিস মিলিটারি ঘিরে ফেলে। বস রশিদ সরকার দুই সুবেদারকে তার কক্ষে বসান। ওরা আমাকে সার্কিট হাউসে নিতে এসেছে দুই লরি সৈন্য নিয়ে। সরকার সাহেব বললেন, টেলিফোন এলো। হ্যাঁ না ইত্যাদি বলে রিসিভার আমাকে দিলেন। অবাঙালি আইয়ুব আলম, আমাকে সাহস দিলেন। ঘাবড়াতে নিষেধ করলেন। আরইউ খান আমাকে চেনেন তাকে রেফার করতে বললেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার বেগের (?) কাছে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত এ পর্যন্ত যারা সার্কিট হাউস গেছেন কেউ ফেরত আসেনি। অনেক যুক্তিতর্কের পর সাব্যস্ত হলো আমি আমার গাড়িতে যাব, ওদের দুই লরি

স্মৃতির পাতায়...

ছোট্ট শহর লালমনিরহাট মূলত রেলওয়ের বিভাগীয় সদর দপ্তরভিত্তিক শহর। এই শহরের অধিকাংশ লোকই ভারত থেকে প্রত্যাগত বিহারী। '৭১-এর উত্তাল তরঙ্গে এই শহরও তরঙ্গায়িত। মার্চ মাসে সারা বাংলাদেশের মতো এই শহরেও প্রতিদিন চলেছে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ। প্রতিদিন শাহাজাহান নামে একজন দেশপ্রেমিক রিকশায় বসে মাইকে গান গেয়ে গেয়ে নগরবাসীকে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করে চলছে। ২৫ মার্চের ঢাকায় ক্রেকডাউনের পর বিহারিদের আবাসিক এলাকা অফিহাট কলোনি স্থানীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। সেই অবরোধে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন শাহাজাহান। শাহাজাহানই লালমনিরহাটে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ।

আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। অন্য ছাত্রদের মতো আমার চেতনায়ও সংগ্রামী শ্রোতধারা বইছিল। মিটিং, মিছিল, সমাবেশের আহ্বানে যখন-তখন ছুটে যেতাম। হাতে থাকতো একটি নতুন দেশের মানচিত্রখচিত হলুদ, লাল এবং সবুজ রঙের পতাকা। ২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সিনিয়র ভাইদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা পিচ্চি বাহিনী লেগে গেলাম পতাকার বেদী তৈরির কাজে। সুন্দর করে ইট দিয়ে বিস্তৃত পরিসরে সুসজ্জিত করে ভিত্তিমূলে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড তৈরি করা হলো। সাহেবপাড়ার উত্তর প্রান্তে এই বেদীমূলে ২৩ মার্চ উত্তোলন করা হলো নতুন দেশের নতুন পতাকা। সমবেত সবাই বিপ্লবী কায়দায় উড্ডীয়মান পতাকাকে সশ্রদ্ধ সালাম প্রদান করলো এবং দারা নামে মেট্রিক পরীক্ষার্থী সিনিয়র ভাই চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি পতাকায় অগ্নীসংযোগ করে গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে 'জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও পাকিস্তানের পতাকা' ঘোষণা করছিল। শত শত ছেলেমেয়ের করতালিতে বারবার স্লোগানে ধ্বনিত হচ্ছিল- 'জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও পাকিস্তানের পতাকা' এবং 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা'। তার পরের ঘটনাপ্রবাহ মুক্তিযুদ্ধের শ্রোতধারা, যা কম-বেশি সবারই জানা।

'৭১-এর ৪ এপ্রিল সকাল ১০টার পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী লালমনিরহাট শহরে প্রবেশ করে। এর পরপরই শুরু হয় শহরব্যাপী হত্যা, ধ্বংস ও লুটতরাজ। দারাকে পাশের বাসায় লুকায়িত অবস্থা থেকে বিহারিরা ধরে নিয়ে যায় এবং সারা রাস্তায় জুতা দিয়ে পেটাতে পেটাতে পাঞ্জাবিদের সম্মুখে হাজির করা হয়। অতঃপর পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর ক্ষোভে আপাদমস্তক বুলেট দিয়ে ঝাঁজরা করা হয়। দারার বাবাকে একই দিন হিংস্র বিহারিরা নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রতিদিন রাতে মৃত্যুর বিভীষিকা পাড়ার সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতো। হেলাল, হেলালের বাবা, টুলুর বাবাকে রাতের আঁধারে বাসা থেকে ধরে নিয়ে অনতিদূরে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়। আলতাফ এবং দুলাল নামে দুই যুবককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। দুই মন্ডল পরিবারের স্ত্রীসহ শিশু নাসিমা, বেনু এবং তাদের দুগ্ধপোষ্য ভাইদের নির্মমভাবে জবাই করে পার্শ্ববর্তী বাগানে পুঁতে রাখা হয়। পাড়ায় একটি মাত্র হিন্দু পরিবার ছিল সেই পরিবারের শিশু মালতি এবং বিনয়কে ড্রেনে ফেলে নির্মমভাবে জবাই করা হয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে মুসলমান বানিয়ে প্রাণভিক্ষা দেয়া হয়। ওয়ালিউর সাহেব, শামসুল আরেফিন সাহেবকে পাঞ্জাবি সেনারা গুলি করে হত্যা করে। লাটু-টুটু নামে দুই যুবক ছিল। তাদের মা হাসপাতালের নার্স ছিলেন। সেই তরতজা যুবকদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এছাড়াও ডাক্তার রহমানসহ তার দুই ছেলেকে এবং হাসপাতালে চিকিৎসারত আইআরপি কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজনকে পাঞ্জাবি সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রতিদিন বিহারিরা বাঙালি লোকজনকে ফুটওভার ব্রিজের কাছে নিয়ে হাজির করতো আর পাঞ্জাবি সেনারা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ব্রাশফায়ারে বাঙালি নিধন করে উল্লাসে ফেটে পড়তো। প্রতি রাতে দূর থেকে ভেসে আসতো আর্ত চিৎকার। নিরীহ বাঙালি হত্যার মহোৎসবে মেতে উঠেছিল হায়েনারূপী বিহারি সম্প্রদায়। সে সময় আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আজ ৩৫ বছর পর সেই সমস্ত স্মৃতি মানসপটে জাগরিত হলে আতঙ্কে শিহরিত হই। এতো রক্ত, এতো ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত এই স্বাধীনতা। প্রতি বছর ২৬ মার্চ এলে আমি আমার সন্তান নিয়ে বাসার ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এবং আমার সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের গল্প শোনাই। যখন দেখি শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে, তখন বুকের মাঝে চাপা বেদনা অনুভূত হয়। আশায় আশায় দিন কেটে যায়। ভাবি, একদিন না একদিন শহীদদের মর্যাদা এই দেশে অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শিরোইল কলোনী, রাজশাহী

সামনে পিছে থাকবে। আমার গাড়ি ড্রাইভ করছেন অবাঙালি ফোরম্যান ইসমাইল। পথে বেশ কিছু সুপরামর্শসহ সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম স্মরণ রাখতে বললেন।

সার্কিট হাউসের হল রুমের মাঝখানে একটা টেবিলের দুপাশে দুটি চেয়ার। মেজর বোখারি, হাতে লাল কালিতে উর্দু লেখা একটা কাগজ। আমাকে বসতে বললেন। প্রথম প্রশ্ন, আপনি আওয়ামী লীগ করেন। -না, আমি সরকারি চাকুরে। কোন রাজনৈতিক দল করার বিধান নেই। তিনি : দল না করলে গত নির্বাচনে আপনি লালখান বাজার কেন্দ্রে জোর করে মানুষকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে বাধ্য করেছেন! আমি : অ্যাবসোলিউটলি ইনকারেক্ট, মাই পোলিং সেন্টার ইজ লালখান বাজার, বাট আই পারফরম্ড মাই ডিউটি অ্যাজ প্রিসাইডিং অফিসার ইন, সরাইপাড়া প্রাইমারি স্কুল সেন্টার। ইট ক্যান ভ্যারিফাইড ফ্রম ডিসি'জ অফিস, হু বিইং দ্য রিটার্নিং অফিসার, অ্যাপয়েন্টেড মি প্রিসাইডিং অফিসার। তিনি : এনি রেকর্ড উইথ ইউ?-নো, অল মাই বিলঙ্গিংস হ্যাভ বিন র‍্যানস্যাক্ড বাই দ্য মিসক্রিয়েন্টস্। হু আর দোজ মিসক্রিয়েন্টস্? - আই ডোন্ট নো। অ্যাজ লেফট মাই গভমেন্ট কোয়ার্টার অ্যামিডস্ট ক্রসফায়ার বিটুইন দি ইপিআর অ্যান্ড পাক নেভি। আই ক্যুড'ন্ট টেক অ্যানিথিং উইদাউট মাই লাইফ, ওয়াইফ অ্যান্ড অ্যা নিউবর্ন চাইল্ড। আবার প্রশ্ন : আপনার বাসার ছাদে এখনও তথাকথিত বাংলাদেশের পতাকা উঠছে। আপনি ইপিআরদের ট্রেঞ্চ করে দিয়েছেন। খানা সাপ্লাই দিয়েছেন, এটাও কি মিথ্যে? ভাবছি , মৃত্যু সন্নিকটে। মরণের আগে মিথ্যে বলবো না। বললাম, দেখুন, মার্চ মাসের সব কয়টা দিন ইস্ট পাকিস্তান চলেছে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। বাঙালিরা তাকে বঙ্গবন্ধু টাইটেল দিয়েছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ করাননি। বাঙালি-অবাঙালি সবাই বাসার উপর পতাকা উড়িয়েছেন, ইপিআরের খানা সাপ্লাই দিয়েছেন, ট্রেঞ্চ খননে সহযোগিতা করেছেন। আমিও। প্রশ্ন : আপনার এলাকায় অবাঙালি কারা ছিল? উত্তর : অসংখ্য। তবে পাক পিডব্লিউডি স্টাফ কোয়ার্টারে আমার বিল্ডিংয়ে আব্দুল হাফিজ ও মোঃ আসলাম, সামনের ভবনে শমশের আলী মালিক তিনজনই পাঞ্জাবি, উপরে ইফতেখার আলী শাহ-সীমান্ত প্রদেশ, এমএজি আনসারী সিন্ধু, সবাই গভমেন্ট অফিসার এবং সপরিবারে। এখানে মুসলিম লীগ, ন্যাপ বা আওয়ামী-পিপিপি'র প্রশ্ন ছিল না। বোখারী বললেন, দেন ইউ অলওয়্যার ভিকটিম অব দ্য সারকামস্টেনসেস্। আমি নীরব। এমনি সময় এক পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন ঢুকে বাম হাতে মেজরের কাছ থেকে লালকালিতে লেখা কাগজটি ছিনিয়ে নিল। একটু পরে কাগজটা টেবিল ছুঁড়ে 'খতরনাত' বলে এমন এক থাপ্পড় দিল যে চোখে

কিছু দেখছি না। কতক্ষণ বোধ জ্ঞান রহিত ছিল, আমি কোথায় ছিলাম, সামনে কেউ ছিল কিনা জানি না।

মেজর বোখারী তরল কিছু খেয়ে যখন স্যরি বললেন, বোধহয় সংবিত ফিরে এলো। স্যরি মিস্টার রফিক, ক্যাপ্টেন হামিদ অপারেশনঘটিত দেমাগ খারাপ ছিল। আইম রিয়েলি স্যরি। মেজরের কথাগুলো পীড়াদায়ক পরিহাস মনে হলো। তিনি প্রায় শেষ প্রশ্ন (লাল কাগজের প্রশ্নের ক্রমিক অনেক) করলেন, তাহলে আপনি সংবিধানের মৌলিক অধিকার লংঘন করে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি? -পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছি।-কাকে? -আওয়ামী লীগকে। -বলছেন আওয়ামী লীগ করেন না। আবার ভোট দেন! ফর প্রভিন্সিয়াল অটোনমি। বোখারী রিভলবারটা হাতে নিয়ে আমার পাশে এলেন। আমি কলেমা পড়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আপ ছাচ্চা কাঁহা। ও হারমিলোগ কাঁহা, মুসলিম লীগ কো ভোট দিয়া। এতক্ষণে দেখলাম গোটা পঞ্চাশ লোক পিছমোড়া বেঁধে রেখেছে পাশে। ছব লোগ মুসলিম লীগকো ভোট দিয়া তো ফেল কারে কেয়ছে? আপনি যান, এডমিনিস্ট্রেশন চালু করতে আপনাদের দরকার আছে। ঠিকমতো কাজ করুন গিয়ে। প্রয়োজনে আবারো ডাকা হতে পারে। কক্ষ হতে বেরুতেই ফোরম্যান ইসমাইল খোশ আমদেদ জানালেন। গল্প গুজবে সেন্ট্রিদের পাশ থেকে আমাকে দেখছিলেন। আটদিন পর রশিদ সরকারের ধমকে আমি বাঙালি হলাম। সবাই ইসমাইল থেকে জেনেছিলেন। আটদিন পর অফিসে সরকার সাহেবের বাসায়, কোথাও বাংলা বলিনি; হতে পারে প্রচন্ড ভয় অথবা কানে হামিদের থাপ্পড়।

জুলাইয়ের প্রথমেই আগরতলা পৌঁছি। লতিফ সাহেবের সাথে রাজবাড়ীর গেটে পরিচয়পত্র ইস্যু করি। এমএনএ সাহেব নিয়ে গেলেন। উদ্বাস্ত শিবিরে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করতে। আমার থানার কোনো নেতা পাওয়া যাচ্ছে না। নোয়াখালীর রুহুল আমিন ভূঁইয়া, নুরুল হক, নরসিংদীর গাজী ফজলুর রহমান এমপি, ঢাকা-কাপাসিয়ার ফকির শাহাবুদ্দিন ও অন্যান্য নেতারা আমাদের ছেলেদের দেখাশুনা করছেন। চট্টগ্রামের নেতা হান্নান ও জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেব একটা জিপে যাচ্ছিলেন, অনেক দূরের উদ্বাস্ত শিবিরে। আমাকে উঠিয়ে নিলেন। আমার পুরা কাহিনী শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে পাকা রসিদের মাধ্যমে চাঁদা তুলে দেবার দায়িত্ব দিলেন। রসিদ বাংলায়, বিপদ হলো সিলের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে। চট্টগ্রাম এসে দুটি বই রেখে বাকিগুলো পৌঁছে দিলাম। ফরিদ আহমেদ, কিরণ চন্দ্র দাস, আবদুস সাত্তার, স্মৃতিকণা, মিসেস সরকার প্রমুখের দায়িত্ব বন্টন করে দিলাম। সীমান্ত হোস্টেলে অপারেশন লগবেস স্থাপিত হয়েছে। কর্নেলের প্যাডে এক চিঠি নিয়ে এক হাবিলদার এলো, এখনই যেতে হবে। প্যান্টের টিকিট পকেটে রসিদ বই। টয়লেটে গিয়ে মোজা খুলে পায়ের তলায় রসিদ বইটি রেখে নিজের জিপে গেলাম। লগবেসে ঢুকতে সোজা পর্যন্ত চেক করলো। জুতার তলা পর্যন্ত চেক করলো। ভাগ্যিস মোজা খুলেনি। কর্নেল কিছু কাজ করে দিতে বলে টুআইসিকে নির্দেশ দিল স্থান দেখিয়ে দিতে। রাত ১১টায় সাংবাদিক শামসুল আলমের হাজী পাড়ার নতুন ছোট্ট বাসায় গেলাম। তার পরামর্শে আগ্রাবাদ কলোনিতে একটি টিনশেড সাবলেট নিলাম এবং লগবেস-এর কাজ ব্যক্তিগতভাবে সুপারভিশন করলাম। সবাই খুশি।

মমিনুল হক তার ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের গাড়িতে কদাচিৎ ২/১ মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় নিয়মিত অস্ত্র বহন করেন। দুজনের যাতায়াত আছে। ভুলেও অফিসিয়াল ছাড়া কোনো আলাপ হয়নি। তবে চোখ দেখেই দুজনে বুঝতে পারতাম ব্যস্ত নাকি ফ্রি! রুহুল মতিন, রশিদ সরকার নিজেও বন্ধুর থেকে সংগ্রহ করে অনেক টাকা দিয়েছেন। কামালউদ্দিন চৌধুরী আমাকে পছন্দ করতেন না। এক সুযোগে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের কথা বললে কোনো জবাব দিলেন না। বললাম, স্যার আপনি ব্যস্ত। ইচ্ছে হলে কিছু দেবেন আপনার স্টেনোর কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেবে। পরদিন স্টেনো কিরণকে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, আমি পাবো। যেন পৌঁছে দেন। তিনি কিরণকে রসিদ ফেরত দিলেন। আমার শেডের ২০০ গজ দূরে ৫০ বেডের হাসপাতালে আর্মি ক্যাম্প। আমার বাসার তালার দুটি চাবি অন্যদের কাছে। আমি প্রায়ই ক্যাম্পের ওপারে রশিদ সরকারের বাসায় থাকি। জাহাজ ডুবানোর কাজে সীফ্রগরা তাদের অস্ত্রগুলো রাখেন সিলিংয়ের ওপর। ইতিমধ্যে আমাকে পাঞ্জাবিরা সন্দেহের চোখে দেখছে। হান্নানভাই খবর পাঠালেন, তার সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম ত্যাগ না করতে। শামসুল আলম সাহস দিচ্ছেন। অবশেষে হান্নানভাই মুক্তিযোদ্ধা এক গ্রুপের কমান্ডার ইউসুফকে দিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আগরতলা যাবার জরুরি সংবাদ পাঠালেন। মালেক চাচা, ফারুক সর্দার পিআইয়ের স্টল সার্ভিসে কুমিল্লা আসার ব্যবস্থা করে দিলেন। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে একটা বাস চেক করছে। আমার বেবিট্যাক্সি চেক করতে এলো রাজাকার। সে বাড়াবাড়ি করতেই এক ধমক দিলাম। সে চিৎকার করে, ওস্তাদ এদিক আইয়ে। এক পাকি সিপাহী বাস থেকে নেমে এসে পরিচয়পত্র দেখলো মনোযোগ দিয়ে। বললো, কিয়া হুয়া? রাজাকারটা কিছু বলার আগেই বললেন, দেখোনা, ইয়ে বেতমিজ কিয়া কারতা! আফসারকা ছাথ্ কেয়ছে বাত্ কারনা ইয়ে আদব না সিখ্খা। পকেট থেকে কর্নেলের প্যাডে ওই চিঠিটা বের করতেই মনোগ্রাম দেখে স্যালুট দিল। সাথে সাথে রাজাকারটিও কোমর পর্যন্ত হাঁটু তুলে স্যালুট দিল। দুজনে আমার স্যুটকেসটা বেবিট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে আবার স্যালুট। আমার সাথে ২টি বাইনোকুলার এবং আমার থানার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কতকগুলো টর্চলাইট ছিল। আমাদের থানা ঢাকার নিকটবর্তী বলে চম্পকনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যান্টনমেন্ট এবং আমাদের বাড়িতে ব্রিটিশ আমলের ভাঙা দালানে জেলখানা ছিল। দায়িত্বে ছিলেন গিয়াসউদ্দিন (পরে মেজর)।

ত্রিপুরার বিশালগড় থেকে আগরতলাগামী বাসে উঠেছি। বসার জায়গা নেই। দুজন টিপরা রমণী উঠে তাদের সিটে বসার অনুরোধ করলেন, বন্ধু বসো-তুমি জয়বাংলার লোক। শেষপর্যন্ত দু'সিটে তিনজন বসে আগরতলা পৌঁছলাম। জহুর আহমেদ চৌধুরী তখন মুজিবনগর সরকারের সেক্টর-২-এর এডমিনিস্ট্রেটর। আমাকে জয়েন করতে বললেন। আমার দায়িত্ব দিলেন অর্গানাইজার অব সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন ৩ ডিসেম্বর থেকে সর্বাত্মক যুদ্ধ। তিনি বললেন, বাংলাদেশে ঢুকতে। কি করে? বললেন, মেজর হায়দার গেরিলা ট্রুপ নিয়ে খালেদ মোশাররফের আর্টিলারি কভারেজ ঢুকছে। তুমি তাদের সাথে যাবে। ব্রিজ উড়িয়ে দেবার কাজে মেজর হায়দার ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত আমাকে গাইড হিসেবে নিলেন। এরপর মুরাদনগর হেডকোয়ার্টারে থাকার নির্দেশ দিলেন। একজন শহীদের ওয়্যারলেসটার অপারেশন শিখিয়ে 'চার্লিচার্লি' কোডনেইম দিলেন। আগরতলার 'গভার' থেকে যে নির্দেশ আসে তা পালন করতে বললেন। ডা. ওয়ালী আহমেদ দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হয়েছেন। প্রথমবার তার বড় ছেলে শাহ আলমসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ছাড়া পাবার সময় রেজিস্টারে দেখে এসেছিলেন ডা. ওয়ালী এক্সিকিউটেড। তাই হতে চলেছিল, তেলিয়াপাড়া হতে দুলড়ি হতাহতদের মধ্যে জীবিতদের অপারেশনের জন্য বধ্যভূমি হতে ফেরত এসেছেন। তার ছেলে সফিক ওয়ান্টেড।

মুরাদনগর এসে প্রায় দুমাইল দূরে ইউসুফনগর গিয়ে ওয়ালী ডাক্তারের পরিবার, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নৃশংসভাবে নিহত সুবেদার (মেজর) মতিউর রহমানের স্ত্রী ও ইসপাহানী কলেজের প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের কন্যা সেতারা ও তাদের পরিবারের সাথে দেখা হলো। সেতারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএর ছাত্রী। মুরাদনগর প্রায় মুক্ত। ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার মান্নান ওসির দায়িত্ব পালনে সংকোচ করলে, লিখে দিলাম মিঃ এম এ মান্নান, ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ওসি মুরাদনগর পিএস ইন দ্য র‍্যাংক অ্যান্ড স্টেটাস অব ক্লাসওয়ান গেজেটেড অফিসার। তিনি জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। ইতিমধ্যে সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামাল (বাংলাদেশ আর্মির মেজর হিসেবে) ১৩৭ জন সেনাকে রিসিভ করা, একবেলা ভাত খাওয়ানো ও ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোর রিসিভ এবং দু'দলকে গাইড দিয়ে পাঠানোর দায়িত্ব পালন করলাম চার্লিচার্লি হিসেবে। নতুন নামটা অপারেশন হেডকোয়ার্টারে মেজর হায়দারই জানিয়েছিলেন।

২২ ডিসেম্বর অপরাহ্নে মুজিবনগরস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে অব্যাহতি নিয়ে পূর্বতন কর্মস্থলে সাবেক পদে যোগদান করে যথারীতি চাকরি করে ২০০০ সালের ১ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছি। ছেলেমেয়েদের বলি, আমি রাজাকার ছিলাম না। তবে আমি কি মুক্তিযোদ্ধা?

সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স,
বাংলাদেশ

স্মৃতিতে অম্লান '৭১

মোঃ বজলুর রশীদ

১৯৭১ সাল। সবেমাত্র ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠেছি। অজপাড়াগার স্কুল বলে তখনও ক্লাস পুরোদমে আরম্ভ হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পাকহানাদারদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ। তাই বাবার কৃষি কাজে পুরোদমে লেগে গেছি। বাবাও খুব খুশি। স্কুলে না যাওয়ায় নেই কোনো পড়ার চাপ। আর এ ফাঁকে যে কয়টা পুরনো বই সংগ্রহ করেছিলাম তা যে কোথায় পালিয়েছে তার কোনো হদিস নেই।

আমাদের বাড়ির আশপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না। তাই যেকোনো খবরই আমরা দেরিতে পেতাম। এলাকার হৃতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পেটের খবর ছাড়া অন্য কোনো খবরে আগ্রহও ছিল না। আগামী কালের কামলাটা কোন গেরস্থের বাড়িতে দিতে পারবে এটাই তাদের কাছে বড় খবর। আমাদের উৎপাদিত চাল, ডাল, লবণ, মরিচ, কাপড়, কাগজ পশ্চিম পাকিস্তানিরা সস্তায় পায়। আর আমাদেরই উৎপাদিত পণ্য আমরা কি না ওদের চেয়ে দ্বিগুণ দামে কিনি। পশ্চিম পাকিস্তান মরুভূমি আর পূর্ব পাকিস্তান সোনার খনি। আমাদেরই সোনা ওরা উপভোগ করে আর আমরা চেয়ে থাকি। এ ধরনের বৈষম্যের কথা আমরা গ্রামের অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণকে বোঝাতাম। জনগণও আমাদের কথায় বিশ্বাস করত। এ বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতেই '৭০-এর নির্বাচনে এলাকার জনগণ একচেটিয়া আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। তাদের আশা ছিল শেখ মুজিবকে ভোট দিলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তা দরে কিনতে পারবে। কিন্তু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ওয়াদা যে কত বড় প্রতারণা ও ভাঁওতাবাজি ছিল তা বোঝা যায় তাদের কথিত ছয় আনা দিস্তার কাগজ আমরা এক টাকা ছয় আনা দিয়ে কিনেছি। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বঞ্চনা, বৈষম্যের কথা আমরা বড়দের কাছে শুনে ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহ অনুভব করতাম। সত্য-মিথ্যা এসব কথা এলাকার জনগণকে বলতাম। তারা ভাবত তাইতো আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এত কষ্ট করতে হবে না খেটে খাওয়া মানুষগুলোর।

স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খবরও বন্ধ। বড়রা বর্তমান হালচাল জানার জন্য আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করত। আমরা কে গোবিন্দাসী বাজার বা গঞ্জ অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ গেলে তার খোঁজ নিয়ে তার বাড়িতে ভিড় জমাতাম নতুন খবর জানার জন্য। এখানে বলে রাখা ভালো, আমাদের এলাকাটা যমুনা নদীর মাঝের একটি চরে। যমুনা নদীর করাল গ্রাসে এখানকার জনসাধারণ যেমন দরিদ্র তেমনি অশিক্ষিত। তাই '৭১ সালে কারো বাড়িতে রেডিও থাকা মানে কল্পনার বাইরে। তাই লোকমুখের কথাই ছিল খবরের প্রধান উৎস।

বছরের মাঝামাঝি দিকে শেখ মুজিব সম্পর্কে কোনো খবরই পেতাম না। এর মধ্যে খবর এলো শেখ মুজিবকে জীবন্ত কবর দিয়েছে। এ খবরে আমরা যেমন মর্মাহত তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছে। হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাড়ির কাছ দিয়ে প্রতিদিনই নদীপথে লোকজন ট্রেনিং দিতে মাইনকার চরে যাচ্ছে। সাইজে ছোট হওয়ায় কেউই আমাকে নিতে রাজি হয়নি। তখন মনে হতো কেন দ্রুত বড় হচ্ছি না। লম্বা হওয়ার জন্য তখন পেয়ারা গাছের ডালে ঝুলতাম। মুক্তিবাহিনীর সফলতার খবরে আমরা কত যে খুশি হতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। স্বাধীনতার জন্য তখন পুরো জাতি উদগ্রীব! লোকমুখের খবরই ছিল তখন একমাত্র উৎস।

ভাদ্র মাসের শেষ বা আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে হবে। বাবা গোবিন্দাসী হাটে গেছেন। তিনি সব সময়ই হাট থেকে অনেক রাতে ফেরেন। উদ্দেশ্য, হাটের শেষের দিকে একটু সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য তখন পচার ভাগটাও বেশি থাকে। ৯ জন লোকের অভাবের সংসারে বাবা একাই প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছেন আমাদের মুখের যোগান দিতে। আমি বাবার ৩য় সন্তান। আমরা সবাই ছোট। তাই বাবা বাড়ি না থাকলে, কি যে হইহুল্লোড়, কান্নাকাটি, মারামারি লাগত তা বলার মতো নয়। মা একা এত ছেলেমেয়ের সামাল দিতে পারতেন না। ধমকে কাজ না হলে তিনি যদিও কদাচিৎ শাসন করার জন্য চড়-থাপ্পড় মারতেন। আমরা তখন আরো বেয়ারা ধরে যেতাম। মা তখন বাবার বাড়ি আসার ভয় দেখাতেন। তাই বাবা বাড়ি আসামাত্রই আমরা সবাই চুপ।

মা ভাত পাকিয়ে তরকারি কুটে বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। কারণ লবণ, মরিচ, তেল সবই যে হাটে। আমরা বাবার আসার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছি। ক্ষুধার জ্বালায় ছোট ভাইবোনদের কেউ কান্নাকাটি করছে, কেউবা ঘুমিয়ে পড়ছে। আবার পায়ের আওয়াজ পেয়েই আমরা দৌড়ে তার কাছে গেলাম। তার অনুপস্থিতিতে কে কাকে গালি দিয়েছে, কে থাপ্পড় মেরেছে, কে মুখ ভেংচিয়েছে, কে কাকে থুথু দিয়েছে আমরা একেকজন তার কাছে নালিশ করতাম। বাবাও বিজ্ঞ বিচারকের মতো সব শুনে মামলার গুরুত্ব ও অন্যায়ের ধরন শুনে একেক জনের একেক ধরনের দন্ড দিতেন। বাবার এ ধরনের দন্ডে কেউ জয়ী হয়ে আমরা খুশি আবার কেউ বেজার হয়ে গোমড়া মুখে বসে থাকতাম। আবার বাবাকেই এ অভিমান ভাঙাতে হতো। বাজার নিয়ে বাবা হেঁসেল পারে যেতেই মায়ের অভিযোগ 'হাট সাইফটা না আইলে অয়না? এত রাতে কখনই বা সালুন রান্দিমু আর কখনই বা বাচ্চাদের খাবার দিমু?' সবার অভিযোগ আমলে নিলেও মায়ের অভিযোগটা গায়ে না মাখিয়ে বাবা বললেন, হাটে আজ এক খবর শুনলাম। মৌওলানা (মৌলানা ভাসানী) বলেছেন, মরিচ আটার পাটা উপুড় করে তার ওপর কাসার বদনা রেখে, চারিপাশে কাদা মাটি দিয়ে লেপে, বদনার কান্দা ধরে জাগালে যদি পাটা ওপরে উঠে, তাহলে শেখ মুজিব বেঁচে আছে। আর না উঠলে তিনি বেঁচে নেই। আমাদের সবার বড় রোকেয়া বু'কে পাটা ধুয়ে তাড়াতাড়ি মরিচ বাটতে বলে মা হেঁসেলে তরকারি চড়াতে গেলেন। আমি ও আমার বড় ভাই ততক্ষণে ভাতের প্লেটে বাড়ির কাছের ডোবা থেকে কাদামাটি নিয়ে হাজির। বু কেবলই পাটা উপুড় করে বদনা রেখে চারপাশে কাদা দিতে যাচ্ছে, এমন সময় মা মরিচ বাটা নিতে এসে দেখে পাটা উপুড় করা। মা তো বুর পিঠে কয়েক কিল মেরে পাটা সোজা করে মরিচ পিষতে পিষতে বকতে লাগলেন, কখন তরকারি পাকাবে আর কখনই বা বাচ্চাদের খাবার দেবে? কাঁচা ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে গেলে তারা আরও বেশি ঝামেলা করবে। আবার ক্ষুধার জ্বালায় ভালো না ঘুমিয়ে রাতে বিরক্ত করবে। তার জীবনটা এভাবেই গেল। আসলে মার রাগ বাবার ওপর, তার দেরিতে বাড়ি ফেরা নিয়ে।

মার রাগে আমরা সবাই ফুটা বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। মা দুই ফেসে মরিচ বেটে চুলার কাছে গেলেন। আর বু'কে আদেশ দিলেন তাড়াতাড়ি থালা-বাসন ধুয়ে রেডি করতে। মা পাটার কাছ থেকে সরা মাত্রই আমরা পাটার ওপর করে বদনা রেখে কাদা দিয়ে লেপে ফেললাম। আমাদের বহু প্রতীক্ষিত বদনার কান্দা ধরে আস্তে আস্তে পাটাটা তোলার চেষ্টা করলাম। চারদিকের সবার চোখ পাটার ওপর। এই বুঝি পাটা উপরে উঠল। আমাদের মাঝে সে কি যে উদগ্রীব, উৎকণ্ঠা!! শেষমেশ বাবাও একবার চেষ্টা করলেন। পাটা একবার উঠতে নিয়ে উঠল না। ফলে আমাদের পরীক্ষা থেকে শেখ মুজিব জীবিত না মৃত এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারলাম না। সে দিন সারা রাত আমরা কেউই ঘুমাতে পারিনি। এ মহান জাতীয় নেতার সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে যেভাবে টানাটানি, তাতে মনে হয় '৭১ সালে পাক হানাদারদের হাতে মৃত্যুবরণ করলে ইতিহাসের পাতায় তিনি আরও কতই না উজ্জ্বল হয়ে থাকতেন।

UREA PRODUCTION
SIRTE OIL CO, FOR PRODUCTION &
MANUFACTURING OF OIL & GAS
P.O BOX - 385/ TRIPOLI, LIBYA.
rashid8732@yahoo.com

মুক্তিযোদ্ধা পরিবার

মোঃ মনিরুল ইসলাম হিরু

১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের এক উজ্জ্বলময় অধ্যায়। এ সময় দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফসল স্বরূপ দেশ স্বাধীন হয়। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দিতে হয় ত্রিশ লাখ তাজা প্রাণের আত্মাহুতি এবং দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিসর্জন। আর এভাবেই এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের ঘরে ওঠে স্বাধীনতার সোনালি ফসল। আমাদের আকাশে উদিত হয় আকাঙ্ক্ষিত রক্তিম সূর্য। '৭১-এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের জন্য যুদ্ধ করা এবং জীবন দেয়া অবশ্যই গর্বের ও অহঙ্কারের। যারা এই সুযোগ পেয়েছে তারা অবশ্যই ভাগ্যবান। আর আমরা যারা এই সুযোগ পাইনি তারা অবশ্যই হতভাগা। কিন্তু তাই বলে আমাদের মন হতে হারিয়ে যায়নি '৭১। বরং তা আরো গভীরভাবে প্রথিত আছে আমাদের হৃদয়ে। ১৯৭১-এর পূর্বে জন্মগ্রহণ না করা এবং '৭১-এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার হাহাকার এখনো বেজে ওঠে বুকের মাঝে। আর তাইতো গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি ৭১'র শহীদ ও জীবিত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

স্কুল জীবন হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত ৭১'র যুদ্ধের যে পরিসংখ্যান আমরা পাচ্ছি তা হলো ত্রিশ লাখ লোক নিজ জীবন দিয়েছেন এবং দুই লাখ মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হলো ঠিক এ জায়গায়, এই ত্রিশ লাখ শহীদের সকলের পরিবারকে কি সঠিক সম্মান করা হচ্ছে? জীবিত মুক্তিযোদ্ধা সর্বমোট কত জন। এদের সকলকে কি রাষ্ট্রীয় সম্মান করা হচ্ছে? যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হয় না, তাহলে আমার কোনো বক্তব্য বা ক্ষোভ নেই। আর যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তবেই আমার আপত্তি। কারণ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সম্মান হিসেবে আমরা পাচ্ছি না আমার দাদী ও আমার মোতাহার চাচার সম্মান। এবং পক্ষান্তরে জীবিত মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পায়নি ছয় বছর আগে মৃত্যুবরণকারী আমার হারুণ চাচা এবং আমার বাবা। উল্লেখিত চার জনের কেউই কোনো প্রকার সম্মান বা সনদপত্র কিছুই পাননি সরকার কর্তৃক। সকল সরকারই তাদের অবহেলা করেছে। '৭১ পরবর্তী স্বাধীনতার সপক্ষের সরকার। ৭৫'র পর সেনা শাসন, ৯১'র বিএনপি সরকার, ৯৬'র আওয়ামী লীগ সরকার এবং বর্তমান জোট সরকার কোনো সরকারই তাদের সম্মান করেননি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তখন আমার বাবা চট্টগ্রামের লালখান বাজার এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঐ এলাকার যুব ও তরুণদের একত্রিত করে যুদ্ধে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নিজে থেকে যান এলাকায়। কারণ, এলাকার সংগঠকের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তিনি এলাকায় থেকে টাকা সংগ্রহ, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা, অপারেশনের দায়িত্বে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, অস্ত্র লুকিয়ে রাখাসহ সকল প্রকার কাজ করে গেছেন। তিনি দু'বার রাজাকার কর্তৃক ধৃত হন এবং ফায়ারিংয়ে পড়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে যাওয়া আমার বাবার মুখে প্রায়ই আমরা সেই দিনগুলোর কাহিনী শুনি এবং মনের মাঝে অন্যরকম এক কাঁপন অনুভব করি। মনে হয় আমিই যেন '৭১-এ অবস্থান করছি।

পক্ষান্তরে আমার হারুণ চাচা ময়মনসিংহ এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার অনেক অপারেশনের কথা আমাদের বলেছিলেন। অপরদিকে '৭১-এ শহীদ হওয়া আমার দাদী ও মোতাহার চাচা যুদ্ধের সময় আমাদের নিজ গ্রাম বরিশালের ঝালকাঠি জেলার নলবুনিয়া গ্রামে। আমার দাদী যিনি আয়নব বিবি নামে পরিচিত ছিল আমাদের গ্রামে। তিনি ছিলেন তখনকার সময়ে ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেত্রী এবং স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঝালকাঠি জেলায় কোনো প্রকার মিটিংয়ে আমার দাদীর অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। বাবা-মায়ের মুখে শুনেছি বঙ্গবন্ধু আমার দাদীকে 'বুড়ি মা' বলে ডাকতেন। আর আমার চাচা মোতাহার ছিলেন স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তারা মা ও ছেলে উভয়ই এলাকায় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে আমার দাদী ছিলেন প্রচন্ড ধূর্ত ও রাগী একজন মহিলা। আর এ কারণেই রাজাকাররা আমার দাদীকে মেরে ফেলতে একটু বেগ পোহাতে হয়। আমার দাদী ও চাচাকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেই দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১১ নবেম্বর। তখন ছিল রমজান মাস। আর সবার মতো আমার দাদী ও চাচা রোজা রেখেছিলেন। আসরের নামাজের পর তারা ইফতারির আয়োজন শুরু করে। সেদিন আবার আমার চাচার প্রিয় মুরগিটি জবেহ করা হয়েছে ইফতারের আয়োজনে। ইফতারের সময় যখন খুবই সন্নিকটে তখনই বাড়ির উঠানে এসে আমার চাচার নাম ধরে ডাক দেওয়া হয়। আমার চাচা সরল বিশ্বাসে ঘর থেকে বের হয়ে এলে তাকে আটক করা হয়। এবং আমার চাচাকে ব্যবহার করে আমার দাদীকে বাইরে ডাকা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। তাদের দুজনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। পিছনে পড়ে থাকে তাদের ইফতারের আয়োজন। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের গ্রামের স্থানীয় নদী বিশখালী পাড়ে। দুই মা ও ছেলেকে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয়। তারপর ৭১'র চিরাচরিত সেই ফায়ার। মুসলমান নামধারী ঐ জানোয়াররা রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করেন আমার দাদী ও চাচাকে। তাদের লাশ ফেলে দেওয়া হয় বিশখালী নদীতে। হারিয়ে যায় আমার দাদী ও চাচা। নীরবে মুছে যায় বাংলার ইতিহাস হতে দুই জন বীর শহীদের নাম। কেউ চিনে না, জানে না এই বীরদের। আমাদের পরিবারের দুইজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও দুইজন জীবিত মুক্তিযোদ্ধা মোট চারজন। এই চারজনের কেউই পাননি যথাযথ সম্মান। কিন্তু আমি আমার বাবা এবং চাচার মাঝে যে দেশপ্রেম দেখেছি তা বলার নয়। তাদের চিন্তায় সর্বক্ষণ ছিল দেশের জন্য শুভ কামনা, শুভ চিন্তা। আমার পরিবারের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান না করায় যে ক্ষোভ আমার মনে বিরাজ করছে তার চেয়েও অধিক কষ্ট ও ক্ষোভ বিরাজ করছে '৭১-এর রাজাকার নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় দেখে, তার গাড়িতে লাল-সবুজ পতাকা দেখে। তার মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে। কেউ হয়ত বলবেন আমি নিজামীকে রাজাকার বলছি অন্যদের কাছ থেকে শুনে। না তা নয়। '৭১-এ যখন নিজামী পাকিস্তান রক্ষা শান্তি কমিটির নামে চাঁদা গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রাম এলাকার লালখান বাজার আসেন। এলাকাবাসী তাকে মারার জন্য একত্রিত হয়ে হামলা করে। তখন সে পালিয়ে বেঁচে যায়। কথিত আছে সে কোনো এক ডোবায় লুকিয়ে তার প্রাণ বাঁচান। ঐ হামলাকারীদের মাঝে সদস্য হিসেবে আমার মাও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

'৭১-এর সত্য কাহিনী আজ পাগলের প্রলাপে পর্যবসিত। আজ মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধার কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়। যেন ঐ জিনিস আবার কি? আমাদের জাতিসত্তা এমনিতেই সৃষ্টি। দেশ আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমরা এসেই এটা পেয়েছি। কিছুদিন পূর্বে এক বয়স্ক লোককে আক্ষেপের সুরে বলতে শুনেছি 'মুজিব ছিল ৭১'-এর রাজাকার আর গোলাম আযম ছিল স্বাধীনতার ঘোষক'। তখন ঐ ব্যক্তিকে আমি সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারিনি। আমার এই লেখনির মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিসহ আরো যারা এমন কথা বিশ্বাস করেন তাদের জানাতে চাই, আপনারা বিশ্বাস হারাবেন না। এই বাংলার মাটিতে যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিন কোনো অপশক্তি হাজারো চেষ্টার বিনিময়েও এই দেশকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারায় আছি।

আহবায়ক
আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান
বন্দর থানা শাখা, চট্টগ্রাম জেলা

সেই সব দিন...

বদরুদ্দোজা হীরা

'উনিশশ' একাত্তর সালের রক্তঝরা সেই উত্তাল দিনগুলো আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজও লাল-নীল জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এ দেশের ইতিহাসে, এ দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সময় এই একাত্তর। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হচ্ছে একাত্তর সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ হচ্ছে এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। তাই তো উনিশশ' একাত্তরের দিনগুলো অম্লান, অক্ষয় হয়ে রবে অনন্তকাল ধরে।

আমার সৌভাগ্য যে আমি একাত্তরের দিনগুলো, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো স্বচক্ষে দেখতে পেরেছি, এ জন্য আমি গর্ববোধ করি এবং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া জানাই তিনি আমাকে সেই সময়ে জন্মদান করেছেন সে জন্য। একাত্তরে আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি। তখন আমার যুদ্ধে যাবার মতো বয়স ছিল না। যদি যুদ্ধে যেতে পারতাম তাহলে হয়তো হৃদয়টা আরও বেশি গর্বে-অহঙ্কারে ভরে থাকতো। কিন্তু নিজ চোখে যা কিছু দেখেছি, যা কিছু শুনেছি তা আমার মনের মধ্যে অম্লান হয়ে গেঁথে রয়েছে। কোনো কিছুই আমি ভুলে যাইনি। সবকিছু এখনও দু'চোখের পর্দায় প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের পর্দার মতো ভেসে ওঠে- যখনই ভাবি সেই দিনগুলোর কথা। এ জন্য আমি মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা আজ যেখানে এই দেশের ইতিহাসকে, স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করে আগামী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে- নিজ চোখে দেখেছি বলে আমি সেসব বিকৃত ইতিহাস মানছি না। আমার হৃদয়ে সত্য ঘটনা, সত্য ইতিহাস যতটুকু দেখেছি, তার সবকিছু আমার কাছে অতি মূল্যবান। আর তাই কোনো মিথ্যা ইতিহাসের সাজানো কথামালা দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না। নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, সেই সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক হীনস্বার্থে তাদের সামনে মিথ্যা ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এমনকি পাঠ্যপুস্তকেও মিথ্যা ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। এসব বিভ্রান্তি থেকে এই প্রজন্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি এখানে ১৯৭১ সালে আমার শিশুকালে নিজ চোখে দেখা কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনার অবতারণা করছি।

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল প্রায় ৫ বছরের মতো। অনেকে ভাবতে পারেন, এতো ছোট্ট বয়সের কথা আমি আজ কেমন করে শোনাবো? কিন্তু আমার কাছে '৭১-এ দেখা দিনগুলো, '৭১-এর ঘটানগুলো এত বেশি আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, সেই দিনগুলো, সেই ঘটনাগুলো আমি আজও ভুলে যাইনি। শুনেছি মনোবিজ্ঞানে একটা কথা আছে- যে ঘটনা শিশুদের মনে বেশি দাগ কেটে যায়, সেই ঘটনা তাদের মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে যায় যে, তা আর ভোলা যায় না। আর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা অন্য যেকোনো সময়ের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর- এতে কারোরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। অন্য রকম বলেই '৭১-এর নিজ চোখে দেখা ঘটনাগুলো আমার শিশুমনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, আজও তা অক্ষয় হয়ে আছে, আমরণ রয়ে যাবে।

আমরা তখন ঢাকার মগবাজার এলাকায় ভাড়া থাকতাম। আমার আব্বা সেই আমলের 'টিআইপি'তে (টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ অব পাকিস্তান) চাকরি করতেন। স্বাধীনতার পর যার 'টিআইসি' অর্থাৎ টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন নামকরণ করা হয় এবং বর্তমানে এর সর্বশেষ নাম দেয়া হয়েছে 'টিএমএস' বা টে-শি-স অর্থাৎ 'টেলিফোন শিল্প সংস্থা'। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন টঙ্গীতে অবস্থিত। ঠিক কবে, কখন, কোন পটভূমিতে ১৯৭১-এ দেশ উত্তাল হয়ে গিয়েছিল সে কথা বলতে পারবো না। শুধু মনে পড়ে মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল ঢাকার রাজপথ। মিছিল করত ছাত্র-যুবক এবং বয়স্ক লোকেরা। এমনকি অল্প বয়সী বালকেরাও মিছিলে যেত। হয়তো এসব ছেলেদের কেউ বাবা-মার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, কেউ বাবা-মার জ্ঞাতসারেই সেই মিছিলে শরিক হতো। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হতো। আমি দূর থেকে সবকিছু দেখতাম। এই উত্তাল ঘটনাগুলোর পেছনে কী কারণ ছিল সেসব বুঝতাম না। তবে বুঝতে পারতাম যে দেশে খুব বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মিছিলের কোনো স্লোগানের কথা মনে নেই, তবে মনে আছে একজন নেতার ছবি। প্রতিকৃতি বহন করা হতো সেসব মিছিলে। পরবর্তীকালে বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি এই নেতা আর কেউ ছিলেন না, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এই নেতার নেতৃত্বেই জাতি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আজ রাজনৈতিক স্বার্থে অনেক নেতাকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমার অতটুকু বয়সে দেখেছি, সমগ্র বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের বিকল্প কোনো কিছুই ছিল না। মুজিব ছিলেন জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা। যখন ভোট হয়েছিল, এমন একটা লোকও ছিল না যে নাকি শেখ মুজিবকে ভোট দেয়নি, নৌকায় ভোট দেয়নি। নৌকার বিকল্প কোনো প্রতীক তখন ছিল না এ দেশের জনগণের কাছে। দেশের সব মানুষ ভোট দিয়েছেন। আমার বাবা-মাকে দেখেছি, আশপাশে সব মানুষকে দেখেছি কী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা দলবদ্ধ হয়ে ভোট দিতে গেছেন। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মাঝে ছিল তখন অদম্য উৎসাহ। তারা রিকশা দিয়ে, বেবিট্যাক্সি দিয়ে মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছে আবার ভোট শেষে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ দেশের অবস্থা খুব অস্থিতিশীল হয়ে উঠল। আমি দেখতাম বড়রা সব সময় দেশের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতো, তাদের কথাবার্তায়, চোখে-মুখে এক ধরনের উৎকণ্ঠা বিরাজ করত। এমনি সময়ে প্রচার হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা করবেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ নিয়ে সবার মাঝে জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। আব্বা আম্মাকে বলতেন, ঐ দিনের ভাষণের পরেই নির্ধারিত হয়ে যাবে বাঙালি জাতির ভাগ্য। এখন মনে পড়ে সন্ধ্যার দিকে আব্বা রেডিও সেট সামনে নিয়ে বসলেন।

'৭১-এ যখন নিজামী পাকিস্তান রক্ষা শান্তি কমিটির নামে চাঁদা গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রাম এলাকার লালখান বাজার আসেন। এলাকাবাসী তাকে মারার জন্য একত্রিত হয়ে হামলা করে। তখন সে পালিয়ে বেঁচে যায়। কথিত আছে সে কোনো এক ডোবায় লুকিয়ে তার প্রাণ বাঁচান। ঐ হামলাকারীদের মাঝে সদস্যা হিসেবে আমার মাও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন

বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়াসহ আশপাশের ছেলে-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ মিলিয়ে বহু লোকের ভিড় জমে গেল। শেখ মুজিব তার ভাষণে কী বলেছেন, এর প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি গোষ্ঠী কী করতে যাচ্ছে- এসব শুনতেই এতো ভিড়। যেহেতু পাকিস্তানি গোষ্ঠী ক্ষমতায়, তাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে সম্প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভবত রেডিওর খবর শোনার জন্যই লোকজন এতটা উদগ্রীব হয়েছিল। সে দিন সন্ধ্যাবেলার সেই খবর শোনার পরই আব্বা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাদেরকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের খবর শোনার পর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। এবারে একটা মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কারণ ঐ ভাষণের মধ্যে জাতিকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বেশ কয়েকবার আকারে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছিল এবং সব শেষে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বলার মধ্য দিয়ে মূলত স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণাই দেয়া হয়েছিল। আব্বার আন্দাজ মিথ্যে হয়নি। তার ক'দিন পরেই আব্বা আমাদের পরিবারের সব সদস্য অর্থাৎ আম্মা এবং আমাদের ৬ ভাই-বোনকে নোয়াখালীর দেশের বাড়িতে রেখে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চাকরির খাতিরে ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। আব্বার এই সিদ্ধান্তের ফলে হয়তো আমরা ২৫ মার্চের কালরাত্রির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। আজ অনেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অনেক কথা বলেন। কিন্তু আমার এটুকু বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সবাইকে বলে দিতে চাই, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরেই মূলত বাঙালি জাতি একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কোনো মেজর-জেনারেলের ঘোষণার জন্য জাতি অপেক্ষা করে থাকেনি। তাছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মেজর জিয়াকে সাধারণ জনগণ চিনতো না। যুদ্ধের ৯ মাসেও দেখেছি সব মানুষ তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের জন্য চোখের জল ফেলেছে, তাঁর জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া চেয়েছে। আর এই দীর্ঘ ৯ মাসজুড়ে মানুষ ৭ মার্চের বজ্রকণ্ঠই রেডিওতে শোনার জন্য অপেক্ষা করতো। একটি রেডিও সেটের সামনে অসংখ্য মানুষ ভিড় করত। আর এই বজ্রকণ্ঠ শুনেই মানুষ যুদ্ধের জন্য মনোবল ফিরে পেত, শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো অদম্য উৎসাহে। স্বাধীনতা লাভের পরও বহুদিন এ দেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে বহুবার ৭ মার্চের ভাষণ বাজানো হয়েছে। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মানুষ তখনও সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ শুনে ব্যস্ত পথিকেরও পথচলা ক্ষণিকের জন্য থেমে যেত, যে ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা পেয়েছিল। মূলত জিয়াউর রহমানের কথা আমি জানতে পারি যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা লাভের পর পর। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জিয়া খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা বা স্বাধীনতার ডাক দেয়ার জন্য নয়। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সঙ্গে তখন আরও কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীর কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। তারা হলেন- মেজর জলিল, কাদের সিদ্দিকী, কর্নেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল শফিউল্লাহ প্রমুখ। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানীর কথাও মানুষ স্মরণ করত। জিয়ার সৌভাগ্য এই যে, '৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর জিয়া ক্ষমতায় আসেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আগ থেকে শুরু করে যুদ্ধের পুরো ৯ মাস এমনকি স্বাধীনতার পরেও জাতির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, শেখ মুজিবের সঙ্গে তুলনা করার মতো সামান্যতম যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেননি। এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে এ দেশের জনগণের অধিকারের জন্য সুদীর্ঘকাল লড়াই করে অবশেষে '৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করেছেন এবং জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। তাঁর ডাকেই মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, তাঁর নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটাই হলো ইতিহাস।

১৯৭১ সালে নিজ চোখে দেখা ঘটনাপঞ্জির একটি খণ্ডচিত্রই এখানে উল্লেখ করেছি মাত্র। সেই সময়ের আরও বহু ঘটনা মনের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে আঁকা হয়ে আছে। যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে এবং সুযোগের অভাবে বলা সম্ভব হলো না। কিন্তু সব কথার শেষ কথা একটিই আর সেটি হলো- ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানেই যুদ্ধ করেছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, অন্য কারো নির্দেশে নয়।

পশ্চিম বিলাসপুর
শহীদ নিয়ামত রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর